



সাওম আমারই জন্য, আর আমি নিজে এর প্রতিদান দেব...

ফিকহস সিয়াম : সিয়ামের বিধান ও মাসায়েল

সংকলন :
মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ

প্রথম সংস্করণ: জুলাই, ২০১০

qurānerālo.com
facebook.com/QuranerAlo

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা :	৫
উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১১
কোর্স পরিচিতি	১৩
অধ্যায় - ১ : সিয়াম সংক্রান্ত প্রারম্ভিক মাসায়েল	১৫
১.১ সিয়ামের সংজ্ঞা	১৫
১.২ ইসলামে সিয়ামের মর্যাদা ও বিধান	১৫
১.৩ সিয়ামের ফযীলত	১৬
১.৪ সিয়ামের পূর্ণ সাওয়াব অর্জনের জন্য যা জরুরী	১৭
১.৫ সাওমের নিয়ত	১৯
১.৬ ওয়াজিব সাওমের নিয়ত	২০
১.৭ নফল সাওমের নিয়ত	২১
১.৮ ফজরের শুরু ও সূর্যাস্তের সময় নির্ণয় সংক্রান্ত মাসায়েল	২৩
১.৮.১ ফজরের শুরু ও সূর্যাস্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া	২৩
১.৮.২ কোন অঞ্চলে দিন কিংবা রাত্রি খুব দীর্ঘ হলে করণীয়	২৫
১.৮.৩ পেনে ভ্রমণকারীর করণীয়	২৬
১.৯ ইফতারের সুন্নাহ	২৮
১.১০ সেহরীর সুন্নাহ	৩০
১.১১ সাওম ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্তসমূহ	৩৩
১.১২ রামাদানের শুরু ও শেষ নির্ণয়	৩৫
১.১৩ যার পক্ষে চাক্রমাসের শুরু কিংবা শেষ নির্ণয় করা সম্ভব নয়	৩৭
১.১৪ চাঁদ দেখা কি বিশ্বের সকলের জন্য একই না ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলেতে ভিন্ন?	৩৮

১.১৪.১ এ সম্পর্কে সৌদি বিশিষ্ট আলেমগণের কমিটির সিদ্ধান্তের সারমর্ম	৩৯
১.১৪.২ এ সংশ্লিষ্ট রাবেতার ইসলামী ফিকহ কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের সারমর্ম	৪১
অধ্যায় ২ : যাদের জন্য রামাদানের সাওমের ব্যাপারে সহজতা রয়েছে	৪৪
২.১ অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফির	৪৪
২.১.১ অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থাতেই তার জন্য সাওমের বিধান	৪৫
২.১.২ মুসাফিরের অবস্থাতেই তার জন্য সাওমের বিধান	৪৬
২.২ হায়েয ও নিফাস অবস্থায় নারী	৫০
২.৩ গর্ভবতী এবং স্তন্যদাত্রী	৫১
২.৪ বার্বক্য কিংবা স্থায়ী অসুস্থতার কারণে অক্ষম ব্যক্তি	৫১
২.৫ ইচ্ছাকৃতভাবে সাওম পরিত্যাগ করা	৫৩
২.৬ কাযা আদায়ের সময়	৫৫
অধ্যায় ৩ : সাওম ভঙ্গকারী বিষয়	৫৭
৩.১ পানাহার	৫৭
৩.২ বমি	৬০
৩.৩ দৈহিক সম্পর্ক	৬১
৩.৪ বীর্যপাত	৬৫
৩.৫ রক্তপাত বা রক্ত-নির্গমন	৬৭
৩.৬ সাওম ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর দ্বারা সাওম ভঙ্গের শর্ত	৭০
অধ্যায় ৪ : নফল সিয়াম	৭৫
৪.১ নবী দাঁড়দের (আ.) সিয়াম	৭৫
৪.২ মুহাররাম মাসের সাওম	৭৭
৪.৩ যুলহিজ্জার প্রথম দশক	৭৮
৪.৪ শাওয়ালের ৩টি সাওম	৭৮
৪.৫ আরাফার দিনের সাওম	৭৯
৪.৬ আশুরার সাওম	৭৯
৪.৭ সোম ও বৃহস্পতিবারের সাওম	৮০

৪.৮ সোমবারের সাওম	৮১
৪.৯ প্রতি মাসে তিনদিন সাওম পালন	৮১
৪.১০ নফল সাওম ভঙ্গ করা	৮১
৪.১১ যে সকল দিবসে সাওম পালন নিষিদ্ধ	৮২
৪.১১.১ দুই ঈদ	৮২
৪.১১.২ আইয়ামে তাশরীক	৮৩
৪.১১.৩ জুম্ময়ার দিনকে এককভাবে সাওমের জন্য বাছাই করা	৮৪
৪.১১.৪ শনিবারকে সাওমের জন্য এককভাবে বাছাই করা	৮৫
৪.১২ শাবানের নফল সাওম	৮৬
অধ্যায় ৫ : রামাদানের শেষ দশক ও এর আমলসমূহ	৯০
৫.১ রামাদানের শেষ দশরাত্রি	৯০
৫.২ লাইলাতুল কদরের কিছু বৈশিষ্ট্য	৯১
৫.২.১ লাইলাতুল কদর কোন রাত্রি?	৯৩
৫.২.২ লাইলাতুল কদরের দুআ	৯৭
৫.২.৩ লাইলাতুল কদরের লক্ষণ	৯৭
৫.৩ রামাদানে কিয়ামুল লাইল	৯৮
৫.৩.১ তারাবীর সালাতে রাকাত সংখ্যা কত?	১০১
৫.৩.২ বিশ রাকাত তারাবীর সালাতের তিষ্ঠি কি?	১০২
৫.৪ ইতিকাকফ	১০৪
৫.৪.১ ইতিকাকফের বিধান	১০৫
৫.৪.২ ইতিকাকফের স্থান	১০৬
৫.৪.৩ ইতিকাকফকারীর করণীয়	১০৬
৫.৪.৪ শেষ দশকের ইতিকাকফ শুরু করার সময়	১০৮
৫.৪.৫ নারীর ইতিকাকফ	১০৮
৫.৫ যাকাতুল ফিতর	১০৯
পরিশিষ্ট - ১ : আত্মস্বকরণের জন্য নির্বাচিত কুরআনের আয়াত ও হাদীসের তালিকা	১১৩

ভূমিকা

দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারা একজন ব্যক্তির জন্য কল্যাণের সুসংস্বাদ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।”^১

দ্বীনের এই জ্ঞানের উৎস হল আল-কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআন ও সুন্নাহের জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহকে সঠিকভাবে জানতে পারেন, আল্লাহ পাকের নির্ধারণ করা হালাল ও হারামের সীমারেখা চিনতে পারেন, আর তাই তাঁর পক্ষে সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করা সম্ভব হয়, আল্লাহ পাক বলেন:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

“বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।”^২

আর জ্ঞানই আল্লাহ পাকের নিকট মর্যাদা বৃদ্ধির উপায়, আল্লাহ পাক বলেন:

^১ বুখারী(৩১১৬), মুসলিম(১০৩৭)।

^২ সূরা আল ফাতির, ৩৫ : ২৮।

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“...তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সম্মুন্নত করবেন।”^{১১}

আখিরাতের অনন্ত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যারা প্রতিযোগিতা করতে চায়, তাদের উচিৎ শরীয়তের জ্ঞানচর্চার এই উন্মুক্ত ময়দানে আত্মনিয়োগ করা। শরীয়তের জ্ঞানের দ্বিমুখী কল্যাণ রয়েছে:

প্রথমত, একজন দুইন-শিক্ষার্থী দুইন পালন করে থাকেন অপ্রদৃষ্টি, উপলব্ধি ও দলীলের ভিত্তিতে, ফলে তার জন্য জ্ঞানী ব্যক্তির মর্যাদা অর্জিত হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“সাধারণ ইবাদতকারীর ওপর আলেমের মর্যাদা তোমাদের সবচেয়ে সাধারণ ব্যক্তির তুলনায় আমার মর্যাদার অনুরূপ...”^{১২}

দ্বিতীয়ত, জ্ঞানী ব্যক্তি নিজে যেমন আলোকিত, তেমনি তিনি অপরকেও আলোকিত করেন। এজন্য জ্ঞানার্থী শুধু নিজের আমলের সওয়াব নয়, বরং অন্যদের আমলের সওয়াবও নিজের “হিসাবে” জমা করতে থাকেন। তিনি যাদেরকে দুইনশিক্ষা দেন, তাদের আমলের সওয়াবও তাঁর আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

^{১১} সূরা আল মুজাদিলা, ৫৮ : ১১।

^{১২} তিরমিযী। আনবানীর মতে সহীহ।

“যে হেদায়েতের প্রতি আহ্বান জানালো, তার জন্য যারা তার অনুসরণ করবে, তাদের সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে, অথচ তা তাদের সওয়াব থেকে কোন কিছুই হ্রাস করবে না...”^৬

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন:

“যে ভালকাজের পথ প্রদর্শন করল, তার জন্য রয়েছে এর সম্পাদনকারীর অনুরূপ সওয়াব”^৭

এমনকি মৃত্যুর পর কেউ আমল করতে না পারলেও জ্ঞানী ব্যক্তির সওয়াবের খাতা বন্ধ থাকে না, তিনি তাঁর জ্ঞানের যে প্রভাব পৃথিবীর বুকে রেখে যান, তা থেকে মানুষ উপকৃত হওয়ার ফলে মৃত্যুর পরও তাঁর সওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তার আমল তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, কেবল তিনটি বিষয় থেকে ব্যতীত, অবিরত সাদাকা থেকে, উপকৃত হওয়া যায় এমন জ্ঞান থেকে অথবা সংকর্ষশীল সত্ত্বান যে তার জন্য দুআ করে।”^৮

^৬ মুসলিম(২৬৭৪)।

^৭ মুসলিম(১৮৯৩)।

^৮ মুসলিম(১৬৩১)।

তাই জ্ঞানের পথ-চলার মাঝে রয়েছে শুধুই কল্যাণ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

“যে জ্ঞানের অন্বেষণে কোন পথ চলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথগুলোর একটি পথে পরিচালিত করেন, আর ফেরেশতাগণ জ্ঞান অন্বেষণকারীর প্রতি সন্তুষ্টির কারণে তাঁদের ডানাগুলো অবনমিত করে দেন, এবং আলেমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে আসমানসমূহে অবস্থানকারীরা, যমীনে অবস্থানকারীরা ও পানির অন্তর্স্থিত মাছেরা আর [সাধারণ] ইবাদতকারীর তুলনায় আলেমের মর্যাদা সকল তারার তুলনায় পূর্ণিমার রাত্রিতে পূর্ণচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের ন্যায়, এবং নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী, আর নবীগণ দীনার কিংবা দিরহামের উত্তরাধিকার দিয়ে যাননি, বরং জ্ঞানের উত্তরাধিকার দিয়ে গিয়েছেন, অতএব যে তা গ্রহণ করল, সে এক বিরাট সৌভাগ্যের অধিকারী হল।”^৪

অপর হাদীসে বর্ণিত :

^৪ আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

“নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং পৃথিবী ও আকাশবাসী, এমনকি পিঁপড়া তার গর্ভে, এমনকি মাছও মানুষকে উত্তম বিষয় শিক্ষাদানকারীর ওপর সালাত⁹ পেশ করে।”¹⁰

এজন্য বলা যায়, দুইনের জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তির রয়েছে বহুবিধ মর্যাদা:

- ❖ আল্লাহর বাহাদুরের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করেন।
- ❖ জ্ঞানীগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।
- ❖ যে জ্ঞানার্জনের জন্য পথ চলে তার জন্য জ্ঞান্নাতের পথ সহজ করে দেয়া হয়।
- ❖ জ্ঞানাত্মেষ্টি ব্যক্তি এবং যে মানুষকে উত্তম শিক্ষা দেয় তার জন্য সৃষ্টি, এমনকি গর্ভের পিঁপড়া ও পানির মাছ পর্যন্ত ক্রমা প্রার্থনা করে।
- ❖ মানুষকে উপকারী জ্ঞানদানকারীর ওপর স্বয়ং আল্লাহ পাক, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং অন্যান্য সৃষ্টি সালাত পেশ করে।
- ❖ জ্ঞানী ব্যক্তির রেখে যাওয়া জ্ঞান তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁকে উপকৃত করে।
- ❖ জ্ঞানী ব্যক্তি যাদেরকে তাঁর জ্ঞানের ভিত্তিতে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, তাদের কর্মের সওয়াব তিনি লাভ করেন।

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি জ্ঞানের এই ফযীলত জানার পর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে না কিছুতেই, অবিলম্বে সে পা রাখবে জ্ঞানের ময়দানে, কেননা সে জ্ঞানে না যে তার ভবিষ্যতে কি আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

⁹ আল্লাহ পাক কর্তৃক কারও ওপর সালাত পেশ করা অর্থ উদ্ভূতগতের বাসিন্দাদের নিকট তার প্রশংসা করা। আর সৃষ্টি কর্তৃক কারও ওপর সালাত পাঠ করা অর্থ: আল্লাহ পাক যেন তার প্রশংসা করেন, তার দুআ করা।

¹⁰ তিরমিযী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

:

“পাঁচটির পূর্বে পাঁচটিকে কাজে লাগাও : তোমার মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে, তোমার অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, তোমার ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে, তোমার বার্ধ্যক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকে, তোমার দারিদ্র্যের পূর্বে তোমার স্বচ্ছলতাকে”¹¹

তাই যে সঞ্চয় করতে চায়, সে সঞ্চয় করুক দুীনের “জ্ঞান”।

যে প্রতিযোগিতা করতে চায়, সে করুক “জ্ঞানের প্রতিযোগিতা”।

যে মানুষকে কল্যাণের পথ দেখাতে চায়, সে মানুষকে আহ্বান করুক “জ্ঞানের” দিকে।

যে জীবনে কোন মহান ব্রত নিয়ে পথ চলতে চায়, সে শঙ্ক হাতে ধরুক “জ্ঞানের” পতাকা।

যে জীবনকে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে বিলিয়ে দিতে চায়, সে তার সবকিছু বিলিয়ে দিক দুীনের “জ্ঞান” অর্জন এবং এর প্রচার, প্রসার ও শিক্ষাদানের কাজে।

যে পৃথিবীর জীবনে প্রশান্তি পেতে চায়, সে প্রশান্তি খুঁজে নিক “জ্ঞান”চর্চায়।

যে জান্নাতে যেতে চায় সে চলুক জ্ঞানের রাজপথে...

^{১১} হাকিম। আলবানীর মতে সহীহ।

উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইতিপূর্বে জ্ঞানের যে মর্যাদা ও উপকারিতার কথা আলোচনা হল, সেই জ্ঞানের আলো সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়ার জন্যই এই কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের আওতায় শরীয়তের বিভিন্ন শাখার প্রয়োজনীয় জ্ঞান সুন্দরভাবে সাজানো কোর্স আকারে জনসাধারণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়া এর একটি অন্যতম লক্ষ্য। এই কোর্সগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা, যেন একজন মুসলিম নিজে শরীয়তের জ্ঞানে আলোকিত হওয়ার সাথে সাথে অন্যদেরকে সফলভাবে দ্বীনের জ্ঞান দান করতে সক্ষম হয়, যেন সে নিজে আমল করার পাশাপাশি অন্যকে শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে তার সওয়াবকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে নিতে পারে।

সংক্ষেপে এই কার্যক্রমের বিশেষত্ব:

- ✚ মাতৃভাষায় কোর্সভিত্তিক ইসলাম শিক্ষা, যা ইসলামী জ্ঞানকে সুন্দরভাবে আত্মীকরণের সহায়ক।
- ✚ কোর্সের সাথে গবেষণাভিত্তিক অ্যাসাইনমেন্ট, যা শিক্ষার্থীর ম্বেধা চর্চার সুযোগ করে দেবে।
- ✚ প্রতিটি কোর্সের সাথেই প্রাসঙ্গিক কুরআনের আয়াত ও হাদীস আত্মস্থকরণ, যা জ্ঞানকে দৃঢ় করবে।
- ✚ কোর্সের সাথে রয়েছে অডিও, ভিডিও ও নোট যা এই জ্ঞানের প্রসারে সহায়তা করবে।
- ✚ অনুবাদ হয়নি এমন আরবী উৎস থেকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ।
- ✚ দূরশিক্ষণের ব্যবস্থা, যা শিক্ষার্থীকে ঘরে বসে লেখাপড়া করে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ করে দেবে।
- ✚ কোর্স শেষে প্রখ্যাত আলিম কর্তৃক স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট।
- ✚ প্রতি কোর্সে ভাল ফলাফলকারীদের জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কার।

কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে রয়েছেন:

প্রোগ্রাম ডিরেক্টর:

ড. মোহাম্মদ মনজুর-ই-ইলাহী
পি.এইচ.ডি, এম.এ, ইসলামী শরীয়া
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা।
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

কোর্স কো-অর্ডিনেটর:

মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ

যোগাযোগ:

বাড়ী-৫২/এ, রোড-৯/এ, ধানমন্ডি, (মীনা বাজারের পিছনে)।

ফোন: ০১৭৩৩৫৫৯১৩৫।

ইমেইল: oiepbd@gmail.com

ওয়েবসাইট: www.oiep.org

কোর্স পরিচিতি

ফিকহ ০০৬: ফিকহস সিয়াম() - সিয়ামের বিধান

এই কোর্সটি ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভের একটি: “সিয়ামকে” কেন্দ্র করে। সিয়াম সংক্রান্ত মাসলা-মাসায়েল কুরআন ও সুন্নাহের দলীল এবং নির্ভরযোগ্য আলেমগণের গবেষণার আলোকে সুন্দরভাবে আয়ত্ত করাই এই কোর্সের উদ্দেশ্য। এই কোর্স করার পর একজন শিক্ষার্থী সিয়াম সংক্রান্ত অধিকাংশ জিজ্ঞাসার জবাব সম্পর্কে অবহিত হবেন বলে আশা করা যায়। কোর্সের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মাসলা-মাসায়েলের তালিকা-পাঠ নয়, বরং সুনির্দিষ্ট দলীল ও সাধারণ মূলনীতিসমূহের ওপর ভিত্তি করে কিভাবে এই সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে পদ্ধতিগতভাবে জ্ঞানার্জন এর লক্ষ্য।

সূত্র: এই কোর্সে অনুসৃত নোট তৈরী করা হয়েছে প্রখ্যাত এবং নির্ভরযোগ্য আলেমগণের গবেষণা, লেখনী, আলোচনার ওপর ভিত্তি করে। প্রতিটি স্থানে কুরআন ও হাদীসের রেফারেন্স উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে আলেমগণের ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সর্বত্র আলাদা করে রেফারেন্স উল্লেখ না করে এখানে আমরা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ বা উৎসগুলোর তালিকা উল্লেখ করব।

এই কোর্সে অনুসৃত নোট তৈরীতে ব্যবহৃত সূত্র:

১. শারহ উম্মদাতিল ফিকহ - ড. আক্বুল্লাহ বিন আক্বিল আযিয আল জিবরীন।
২. তাওদীহুল আহকাম মিন বুলুগিল মারাম - শায়খ আক্বুল্লাহ বিন আক্বির রহমান আল বাসসাম।
৩. আশ শারহুল মুমতি আলা যাদিল মুসতাকনি - শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালাহ আল উসায়মিন(র.)।
৪. ফাতাওয়া আল-লাজনা আদ-দাইমা।
৫. মাজমু ফাতাওয়া আশ-শায়খ ইউবনি বায(র.)।
৬. মাজমু ফাতাওয়া আশ-শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালাহ আল উসায়মিন(র.)।
৭. কারারাত আল-মাজমা আল-ফিকহ আল ইসলামী (রাবেতা)।
৮. সাবউনা সুআলান ফি আস-সিয়াম - শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালাহ আল উসায়মিন(র.)।
৯. শায়খ মুহাম্মাদ সালাহ আল মুনাফ্ফিদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রশ্নোত্তরের ওয়েব সাইট: www.islamqa.com
১০. ইসলাম একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত কোর্সের উপকরণ: www.islamacademy.net

মূল্যায়ন পদ্ধতি

ক্লাস শেষে সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা:	২০ নম্বর
গবেষণাপত্র অ্যাসাইনমেন্ট:	২০ নম্বর
নির্বাচিত কুরআন-হাদীস আত্মশুদ্ধকরণ:	২০ নম্বর
মৌখিক চূড়ান্ত পরীক্ষা:	১০ নম্বর
লিখিত চূড়ান্ত পরীক্ষা:	৩০ নম্বর
মোট:	১০০ নম্বর

অধ্যায় - ১ : সিয়াম সংক্রান্ত প্রারম্ভিক মাসায়েল

১.১ সিয়ামের সংজ্ঞা

‘সিয়াম’() শব্দের শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। শরীয়তের পরিভাষায় সিয়াম অর্থ আল্লাহ পাকের ইবাদতের উদ্দেশ্যে ফজরের শুরু থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নির্দিষ্ট কিছু বিষয় থেকে বিরত থাকা। সিয়াম অবস্থায় যে বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকতে হয়, সেগুলোকে ফিকহ শাস্ত্রের() পরিভাষায় বলা হয় মুফসিদাত() বা মুফাত্তিরাত() অর্থাৎ সিয়াম ভঙ্গকারী। যেমন: পানাহার ইত্যাদি।

১.২ ইসলামে সিয়ামের মর্যাদা ও বিধান

রামাদানে সিয়াম পালন করা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি, কেউ যদি সিয়ামের বাধ্যতামূলক হওয়াকে অস্বীকার করে, তবে সে মুসলিম থাকে না। আর যে এর বাধ্যতামূলক হওয়াকে স্বীকার করে কিন্তু তা পালন করে না, সে ফাসিক অর্থাৎ পাপাচারী।

১.৩ সিয়ামের ফযীলত

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“যে ঈমান সহকারে সপ্তমাসের আশায় রামাদানে সাওম পালন করল,
তার অতীতের সমস্ত পুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।”^{১২}

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“আদম সত্তানের প্রতিটি আমলের সপ্তমাস দশপুণ থেকে সাতশতপুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়। আল্লাহ বলেন: সাওম ছাড়া, কেননা নিশ্চয়ই তা আমারই জন্য আর আমিই এর প্রতিদান দেব। [বান্দা] আমার জন্য তার কামনা ও খাদ্য ত্যাগ করে। রোযাদারের জন্য রয়েছে দুটি আনক, একটি আনক ইফতারের মুহূর্তে^{১৩} আর একটি আনক তার রবের সাথে সাক্ষাতের মুহূর্তে।^{১৪} আর তার মুখের পরিবর্তিত ঘ্রাণ আল্লাহর নিকট মেশকের সুঘ্রাণের চেয়েও উত্তম।”^{১৫}

^{১২} বুখারী(৩৭), মুসলিম(৭৬০)।

^{১৩} এর অর্থ হতে পারে দীর্ঘক্ষণ অনাহারের পর পানাহারের সহজাত আনক। অথবা এর অর্থ এক দিনের সাওম পূর্ণ করতে পারার আনক।

^{১৪} কিয়ামতের দিন যখন সে তার সাওমের পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে।

^{১৫} বুখারী(১৮৯৪), মুসলিম(১১৫১)।

অর্থাৎ সিয়াম ব্যতীত অন্যান্য আমলে লোক দেখানো কিংবা অপর কোন উদ্দেশ্যে মিশ্রিত থাকতে পারে। কিন্তু সাওম একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই পালন করা হয়, কেননা রোযাদার গোপনে পানাহার করলে আল্লাহ পাক ছাড়া আর কেউ জানবে না। আর সাওমের ক্ষেত্রে নিয়তের এই একনিষ্ঠতা বা ইখলাসের কারণেই আল্লাহ পাক নিজে এর বিশেষ সওয়াব দান করবেন, যা দশগুণ থেকে সাতশতগুণের সীমায় সীমাবদ্ধ থাকবে না।

১.৪ সিয়ামের পূর্ণ সওয়াব অর্জনের জন্য যা জরুরী

সিয়ামের এই বিরাট ফযীলত ও সওয়াব অর্জনের জন্য সাওমের হেফায়ত করা চাই। সাওম ভঙ্গকারী বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকার পাশাপাশি আরও কিছু বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরী, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“সিয়াম হচ্ছে ঢাল, অতএব [রোযাদার] যেন অশালীন বাক্যব্যয় ও মূর্খতাপূর্ণ আচরণ না করে, আর যদি কেউ তার সাথে লড়তে আসে কিংবা তাকে গালি দেয়, তবে যেন দুবার বলে: আমি রোযাদার।”^{১৫}

অপর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

^{১৫} বুখারী(১৮৯৪), মুসলিম(১১৫১)।

“যে বাতিল কথা ও কাজ এবং মূর্খতাপূর্ণ আচরণ পরিত্যাগ করল না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।”^{১৭}

হাদীসে ব্যবহৃত “কাওনুয় যুর”() শব্দের মধ্যে সকল প্রকার নিষিদ্ধ কথা অন্তর্ভুক্ত। তাই মিথ্যাচার, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, গালি-গালাজ, অশালীন কথা, গীবত বা পরনিন্দা, নামীমাহ^{১৮}, মিথ্যা অপবাদ, অন্যকে নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস এই সবকিছুই এর আওতায় পড়বে।

তেমনি সকল প্রকার নিষিদ্ধ কাজও এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। এর মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

- ❖ দৃষ্টির হেফাজত করা, কেননা অনেকেই সাওম পালনরত অবস্থায় টিভি, কম্পিউটারের পর্দায় নাটক, সিনেমা দেখে সময় কাটায়।
- ❖ আবার অনেকে গান শুনে সময় কাটাতে গিয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়, কেউ বা শপিং মলে ঘোরাঘুরি করে চোখ, কান ও কথার দ্বারা গুনাহে লিপ্ত হয়।
- ❖ এর পাশাপাশি ইঁফতারের আয়োজনে অপচয় হতে দেখা যায়।
- ❖ অনেকে আলস্যের কারণে সাওম অবস্থায় মসজিদে জামাতের সাথে সালাত আদায় না করে বাসায় একাকী তা আদায় করে নেয়।

উপরোক্ত কাজগুলো সব অবস্থাতেই নিষিদ্ধ, আর বিশেষভাবে সাওম পালনকালে এই সমস্ত পাপ আরও গুরুতর, যার কারণে সাওমের সওয়াব বিনষ্ট হয়। তাছাড়া এ ধরনের কাজে লিপ্ত হওয়ার ফলে সাওমের যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ “তাকওয়া অর্জন”, তা ব্যর্থ হয়ে যায়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

^{১৭} বুখারী(৬০৫৭)।

^{১৮} একের কথা অপরের নিকট এমনভাবে প্রচার করা যেন সমস্যা ও বিরোধ সৃষ্টি হয়।

“অনেক রোযাদারেরই সাওমের দ্বারা অর্জন কেবল ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আর বহু নামাযীরই কিয়ামের দ্বারা অর্জন কেবল রাত্রি জাগরণ।”^{১১৬}

১.৫ সাওমের নিয়ত

প্রতিটি ইবাদতের জন্য নিয়ত শর্ত। আর ইবাদতের সওয়াবও নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। তবে নিয়ত অর্থ অস্ত্রের সংকল্প। মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা শরীয়তসম্মত নয়, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখে নিয়ত “পাঠ করা” শেখাননি, তাছাড়া আল্লাহ পাক বান্দার অস্ত্র সম্পর্কে অবগত। এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সালাত ও সাওমের যে ভিন্ন ভিন্ন “নিয়ত” আরবী ও বাংলায় পাওয়া যায় - এ সবকিছুই অপ্রয়োজনীয়, বরং এগুলোর কারণে অনেকের নিকট ইবাদত পালনকে কষ্টকর মনে হতে পারে। মোটকথা কোন একটি ইবাদত সম্পাদনের জন্য অস্ত্রের যে সংকল্প - সেটাই নিয়ত। একজন সালাত আদায়কারী যখন সালাতের প্রস্তুতি নিয়ে ঘর বা কর্মস্থল ছেড়ে মসজিদের দিকে রওনা হয়, তখন বুঝতে হবে যে তার অস্ত্রের নির্দিষ্ট একটি সালাত আদায়ের সংকল্প উপস্থিত, আর এটাই নিয়ত হিসেবে গণ্য হবে, এর চেয়ে বেশী যে কোন কিছুই অপ্রয়োজনীয় এবং শরীয়ত-বহির্ভূত। এক্ষেত্রে সালাতের পূর্বে “আমি কিবলামুখী হয়ে এই ইমামের পেছনে যোহরের ফরয চার রাকাত...” এই কথাগুলো অনর্থক বাক্যব্যয় - যার সপক্ষে কুরআন কিংবা সুন্নাহের কোন দলীল নেই।

^{১১৬} আহমদ, আদ-দারিমী, ইবনু খুযায়মা। ইবনু হিব্বান ও আল-হাকিম একে সহীহ গণ্য করেছেন। আরনাউতের মতে এর সনদ “ছাযিয়্যদ”। এর সমর্থনকারী অন্যান্য হাদীস রয়েছে।

১.৬ ওয়াজ্বিব সাওমের নিয়ত

ওয়াজ্বিব বা বাধ্যতামূলক সাওমের নিয়ত বা সংকল্প ফজরের ওয়াজ্বিব শুরু হওয়ার পূর্বেই থাকতে হবে। এই বিধান রামাদানের সাওম এবং অন্যান্য বাধ্যতামূলক সাওম যেমন: রামাদানের কাযা বা কাফফারা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর দলীল হল:

১) ফজরের পূর্বে নিয়ত না করলে দিনের একটা অংশ নিয়তবিহীন অবস্থায় অতিবাহিত হল, ফলে পূর্ণ একদিনের সাওম আদায় হল না।

২) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত:

“যে ফজরের পূর্বেই রাত্রিতে সিয়ামের সংকল্প করেনি তার সিয়াম নেই।” হাদীসটির অপর একটি ভাষ্য এরকম:

“তার সিয়াম নেই যে রাত্রিতেই তার সংকল্প করেনি।”^{২০}

এছাড়া ইবনে উমার (রা.) থেকেও অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত আছে।^{২১}

^{২০} হাফসা(রা.) থেকে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারাকুতনী এবং অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ। কারও কারও মতে হাদীসটি মাতকুফ, যেমন: বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, আবু হাতিম, বায়হাকী। অন্যদের মতে মারফু, যেমন: ইবনু হায়ম, খাতাবী, আঙ্কুল হক, ইবনুল জাওয়ী, শাওকানী প্রমুখ।

^{২১} মুয়াত্তা, নাসাঈ, তাহাবী।

১.৭ নফল সাওমের নিয়ত

নফল সাওম উপরে বর্ণিত বিধানের ব্যতিক্রম, নফল সাওমের নিয়ত যেকোন সময় করা যাবে, তবে শর্ত হল ফজর থেকে শুরু করে নিয়ত করার মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত সাওম ভঙ্গকারী কোন কিছু যেন সংঘটিত না হয়।^{১২} এর সপক্ষে দলীল হল নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমল:

- -
.« » . « »
» .
.«

উম্মুল মুমিনীন আয়শা(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন আমার নিকট এসে বললেন: “তোমাদের কাছে [খাবার] কিছু আছে কি?” আমরা বললাম: “না।” তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: “সেক্ষেত্রে আমি রোযা থাকলাম।” এরপর আরেকদিন তিনি আসলে আমরা বললাম: “আমাদেরকে ‘হাইস’^{১৩} উপহার দেয়া হয়েছে।” তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: “সেটা নিয়ে এসো^{১৪}, আমি সকাল থেকে রোযা আছি।” এরপর তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খেলেন।^{১৫}

^{১২} এই শর্তের ব্যাপারে আলেমগণের ইজমা রয়েছে।

^{১৩} খেজুর, পনীর, ঘি দিয়ে তৈরী একধরনের খাদ্যদ্রব্য।

^{১৪} শাব্দিক অনুবাদ: সেটা আমাকে দেখাও।

^{১৫} মুসলিম(১১৫৪)।

মাসআলা ১.৭.১: এই হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে নফল সাওম ভঙ্গ করা বৈধ। তবে বিনা কারণে তা করাটা অপছন্দনীয়।^{২৬}

মাসআলা ১.৭.২ : নফল সাওমের ক্ষেত্রে ফজরের পরবর্তী সময়ে নিয়ত করলে পূর্ণদিবস সাওমের সওয়াব পাওয়া যাবে না, বরং নিয়তের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সাওমের সওয়াব পাওয়া যাবে। এজন্য কোন সাওমের ফযীলত যদি কোন নির্দিষ্ট দিবসের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তবে এর ফযীলত অর্জন করতে হলে ফজরের পূর্বেই নিয়ত করতে হবে। যেমন: কেউ যদি আরাফার দিনের সাওমের ফযীলত পেতে চায়^{২৭}, তবে তাকে ফজরের পূর্বেই নিয়ত করে পূর্ণদিবস সাওম পালন করতে হবে। কেউ যদি আরাফার দিনের একাংশে নিয়ত করে, তবে সে সাধারণ একটি দিনের আংশিক সাওমের সওয়াব পাবে, কিন্তু আরাফার দিবসের সাওমের ফযীলত অর্জন করতে পারবে না।

মাসআলা ১.৭.৩: গোটা রামাদানের জন্য একবার নিয়ত যথেষ্ট কি?

রামাদানের সাওম কিংবা অন্যান্য যে সমস্ত সাওম একটানা প্রতিদিন রাখা হয়^{২৮} সেগুলোর জন্য শুরুতে সংকল্প থাকাই যথেষ্ট যদি না এর মাঝখানে কোন ছেদ পড়ে^{২৯}।

মাসআলা ১.৭.৪: একজন ব্যক্তি রামাদানে কোন একদিন সাওম পালনরত অবস্থায় সূর্যাস্তের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়ল এবং পরের দিন ফজর

^{২৬} নফল ইবাদত মাঝপথে ভঙ্গ করলে আংশিক সওয়াব পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

^{২৭} এই ফযীলতের বিবরণ সামনে আসবে।

^{২৮} যেমন রামাদানের দিবসে স্থীর সাথে মিলিত হওয়ার কাফফারা হিসেবে টানা ২মাস সাওম।

^{২৯} যেমন সফরের কারণে কিংবা অসুস্থতার কারণে কেউ সাওম ভঙ্গ করল - এক্ষেত্রে পুনরায় সাওম গুরু পূর্বে নতুন নিয়তের প্রয়োজন।

হওয়ার পর জেগে উঠল, তার এই দ্বিতীয় দিনের সাওম আদায় হবে কি?

উত্তর: পূর্বের মাসআলার সিদ্ধান্তের আলোকে জবাব হচ্ছে: তার দ্বিতীয় দিনের সাওম আদায় হয়ে যাবে, কেননা তার পূর্ববর্তী নিয়তই এক্ষেত্রে যথেষ্ট, সেক্ষেত্রে সে এই পরবর্তী দিনের জন্য নতুন করে নিয়ত করতে না পারলেও ক্ষতি নেই।

১.৮ ফজরের শুরু ও সূর্যাস্তের সময় নির্ণয় সংক্রান্ত মাসায়েল

১.৮.১ ফজরের শুরু ও সূর্যাস্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া

রোযাদারের কর্তব্য ফজরের শুরু ও সূর্যাস্তের সময় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। এ সম্পর্কে জানার জন্য নিম্নলিখিত যেকোন উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে:

- ক. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।
- খ. নির্ভরযোগ্য মুয়াযযিনের ওপর নির্ভর করা।
- গ. নির্ভরযোগ্য প্রচার মাধ্যম কর্তৃক প্রচারিত আযানের ওপর নির্ভর করা।
- ঘ. নির্ভরযোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত/তৈরী ঘোষণা/ক্যালেন্ডারের অনুসরণ করা।

মাসআলা ১.৮.১.১: ফজর হয়েছে বলে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত পানাহার করা যাবে, কেননা মূল হচ্ছে ওয়াক্ত না হওয়া। এছাড়া আল্লাহ পাক বলেন:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ

“আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়।”^{১০}

যদি পরবর্তীতে জানা যায় যে ফজরের পরেও পানাহার হয়েছে, তা সত্ত্বেও সাওম আদায় হয়ে যাবে। কেবলমাত্র কেউ ফজর হয়েছে বলে নিশ্চিত জানার পর পানাহার করলে তার সাওম হবে না।

মাসআলা ১.৮.১.২: সূর্যাস্তের ক্ষেত্রে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত পানাহার করা যাবে না, তবে ম্লেঘাচ্ছন্ন দিনে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব না হলে এবং খুব সম্ভবত: সূর্যাস্ত হয়েছে বলে মনে করলে ইঁফতার করা বৈধ। যেমনটি আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

“নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে এক মেঘের দিনে আমরা ইঁফতার করলাম, এরপর সূর্য উদ্দিত হল।”^{১১}

এক্ষেত্রে পরবর্তীতে পুনরায় সূর্য দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ পানাহার বন্ধ করতে হবে, তবে ইঁতিপূর্বে পানাহারের কারণে সাওমের রুতি হবে না, কেননা তা অজ্ঞতাবশত ছিল। আর যদি পরে তা জানা যায়, তা হলেও সাওম আদায় হয়ে যাবে।

^{১০} সূরা আল বাক্বারা, ২ : ১৮৭।

^{১১} বুখারী(১৯৫৯)।

১.৮.২. কোন অঞ্চলে দিন কিংবা রাত্রি খুব দীর্ঘ হলে করণীয়

যদি সেখানে দিন কিংবা রাত্রির অস্তিত্ব থাকে, তবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সাওম পালন করতে হবে, যদিও বা দিবাভাগ খুব দীর্ঘও হয়, কেননা দিন ও রাত্রির অস্তিত্ব থাকলে নিম্নলিখিত আয়াত অনুযায়ী আমল করা বাধ্যতামূলক:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ

“আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর।”^{১২}

তবে কেউ যদি দিবসের অত্যধিক ঠৈর্ষের কারণে মৃত্যু কিংবা অসুস্থতার আশংকা করে, অথবা কোন আস্থাভাজন অভিষ্ঠ ডাক্তার এ ধরনের আশংকা ব্যক্ত করেন, তবে সে সাওম ভঙ্গ করতে পারবে এবং পরবর্তীতে যখন সে সক্ষম হয়, তখন ঐ দিনটির কাযা আদায় করে নেবে।

যদি এমন অঞ্চলে রাত বা দিন কোন একটির অস্তিত্ব না থাকে, সেক্ষেত্রে সালাত ও সাওমের জন্য নিকটবর্তী যে দেশে দিন ও রাত হয়, সে দেশের সময়সূচীর অনুসরণ করতে হবে। এর সপক্ষে দলীল হল দাঙ্গালের অবস্থানের সময়কাল সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলের বক্তব্য:

^{১২} সূরা আল বাকারা, ২ : ১৮৭।

: ...

: .

...

:

...তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: “চল্লিশ দিন, একদিন এক বছরের মত, একদিন এক মাসের মত আর একদিন এক সপ্তাহের মত আর বাকি দিনগুলো তোমাদের দিনগুলোর মতই।” আমরা [অর্থাৎ সাহাবীগণ] বললাম: “হে আল্লাহর রাসূল, এই যে দিনটি এক বছরের মত, তাতে কি এক দিনের সালাতই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে?” তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: “না। তার পরিমাণ নির্ধারণ করে নাও”...^{৩৩}

অর্থাৎ দিন বা রাত ২৪ ঘণ্টার বেশি হলে সেক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টার দিন ধরে নিয়ে ইবাদতের সময়সূচী নির্ধারণ করে নিতে হবে, আর তাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে নিকটবর্তী সেই অঞ্চলের সময়সূচীর অনুসরণ করতে হবে, যাতে রাত ও দিনের অস্তিত্ব রয়েছে।

১.৮.৩ পুনে ভ্রমণকারীর করণীয়

পুনে ভ্রমণরত অবস্থায় সূর্যাস্ত ও ফজরের সূচনা পুনে থেকে দেখে নির্ণয় করতে হবে, এক্ষেত্রে এরোপুনে যে দেশের ওপর দিয়ে অতিক্রম করছে, সেই দেশের সময়সূচীর অনুসরণ করা যাবে না, কেননা শরীয়তে সাওমের শুরুতে ফজরের শুরু এবং সাওমের সমাপ্তিতে সূর্যাস্তের [অর্থাৎ সূর্যগোলক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হওয়ার] সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, আর তা হবে প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থান অনুযায়ী।

কোন কারণে তা সম্ভব না হলে সাধ্যমত আন্ডাজ করে সাওমের শুরু ও শেষ করবে, কেননা এক্ষেত্রে এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

^{৩৩} মুসলিম(২৯৩৭)।

মাসআলা ১.৮.৩.১: বিমানে ভ্রমণকারী ভূমিতে থাকা অবস্থায় সূর্যাস্তের সময় অনুযায়ী ইফতার করল, এরপর এরোপ্লেন আকাশে ওড়ার পর সূর্য দেখা গেল, এক্ষেত্রে তাকে পানাহার থেকে বিরত হতে হবে না, কেননা তার সাওম শরীয়তসম্মতভাবে পূর্ণ হয়েছে।

মাসআলা ১.৮.৩.২: তেমনি নিজ দেশে ইফতার করার পর ঐ দিন থাকতেই কেউ যদি অন্য দেশে পৌঁছে যায় এবং সেই দেশে দিবাভাগ বিরাজ করে, তবে পানাহার থেকে বিরত থাকার প্রয়োজন নেই এবং সাওম পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা হবে।

কিন্তু যদি সূর্যাস্তের পূর্বেই পুন আকাশে ওড়ে আর এর ফলে দিবসের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় তবে সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত সাওম পালন করে যেতে হবে।

এ সকল মাসআলার সপক্ষে দলীল হল নিম্নোক্ত হাদীস:

“যখন এদিক^{৩৪} থেকে রাত্রির আগমন হয় এবং এদিক^{৩৫} থেকে দিবস প্রস্থান করে আর সূর্য অস্ত যায়, তখন সাওম পালনকারীর ইফতার [এর সময়] হয়।”^{৩৬}

^{৩৪} পূর্ব দিক।

^{৩৫} পশ্চিম দিক।

^{৩৬} বুখারী(১৯৫৪), মুসলিম(১১০০)।

১.৯ ইফতারের সুন্নাহ

১. ইফতার শীঘ্র করা মুস্তাহাব, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“মানুষ কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতদিন তারা শীঘ্র ইফতার করবে।”^{৩৭}

এছাড়া আবু দাউদে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে:

“দুইন বিজয়ী থাকবে যতদিন মানুষ শীঘ্র ইফতার করবে, কেননা ইহদী ও নাসারারা [ইফতারে] বিলম্ব করে।”^{৩৮}

শীঘ্র ইফতার করা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ, আর সুন্নাহের অনুসরণেই নিহিত রয়েছে সকল কল্যাণ। আর দুইনের বিজয় নিহিত আছে অবিশ্বাসীদের বিরোধিতা ও তাদের থেকে ভিন্নতা অবলম্বনের মাঝে।

২. খেজুর দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব। এ সম্পর্কে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত:

^{৩৭} বুখারী(১৯৫৭), মুসলিম(১০৯৮)।

^{৩৮} আবু দাউদ। আলবানীর মতে হাসান।

“আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) [মাগরিবের] সালাতের পূর্বে সতেজ খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন, সতেজ খেজুর না থাকলে শুকনো খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন, আর তা না থাকলে কয়েক চোক পানি পান করতেন।”^{৩৯}

৩. ইফতারের দুআ:

এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল-আস (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“রোযাদারের জন্য ইফতারের সময় একটি দুআ আছে যা ফিরিয়ে দেয়া হয় না।”^{৪০}

তবে হাদীসটি দুর্বল। এছাড়া ইবনে উম্মার (রা.) থেকে বর্ণিত যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইফতার করে বলতেন:

[যাহাবায় যাম্মাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরুকু। ওয়া সাবাতাল আজরু
ইনশাআল্লাহ।]

“তৃষ্ণা বিদূরিত হয়েছে, শিরা-উপশিরা আদ্র হয়েছে আর আল্লাহ চাইলে সওয়াব নির্ধারিত হয়েছে।”^{৪১} এই হাদীসটি হাসান পর্যায়ের।

এছাড়া এই দুআটিও ইফতারের দুআ হিসেবে বর্ণিত আছে:

^{৩৯} আবু দাউদ, তিরমিযী। আলবানীর মতে হাসান সহীহ।

^{৪০} ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে দুর্বল।

^{৪১} আবু দাউদ, নাসাই ও অন্যান্য। আলবানীর মতে হাসান।

[আল্লাহ্‌ন্বা লালা সুমতু ওয়া আলা রিযক্বিকা আফতারতু]
“হে আল্লাহ আমি আপনার জন্য রোযা রেখেছি আর আপনার দেয়া
রিযিক দিয়েই ইফতার করলাম।” কিন্তু এটিও দুর্বল বর্ণনা।

১.১০ সেহরীর সুন্নাহ

১. সেহরীর মধ্যে বরকত রয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম) বলেন:

“তোমরা সেহরী কর, কেননা সেহরীতে বরকত রয়েছে।”^{৪২}

সেহরীতে রয়েছে বহুবিধ কল্যাণ:

- ক. আল্লাহর নির্দেশ পালনের কারণে সওয়াব অর্জন।
- খ. আল্লাহর ইবাদতে শক্তি অর্জন।
- গ. সাপ্তাহে একষেয়েমি দূরীকরণ।
- ঘ. সেহরীর কারণে রাতের গভীরে ঘুম থেকে ওঠা হয়, যা কিনা দুআ
ও ইসতিগফার কবুল হওয়ার সময়, ফলে এ সময়ের ইবাদত, যেমন:
সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, দুআ, ইসতিগফার - এগুলো পালন
করা সেহরীর কারণে সহজ হয়।
- ঙ. সেহরীর জন্য ঘুম থেকে ওঠার ফলে ফজরের সালাত জামাতের
সাথে আদায় করা সহজ হয়।
- চ. এছাড়া সেহরীর মাঝে রয়েছে আহলে কিতাবের থেকে ভিন্নতা
অবলম্বনের সওয়াব, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

^{৪২} বুখার(১৯২৩), মুসলিম(১০৯৫)।

“আহলে কিতাব ও আমাদের সিয়ামের পার্থক্য হল সেহরী।”^{৪৩}

ছ. আল্লাহ পাক ও ফেরেশতাগণ সেহরীকারীদের ওপর সালাত পেশ করেন। হাদীসে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“সেহরী খাওয়া বরকত, অতএব তোমরা একে ত্যাগ করো না, তোমাদের কেউ যেন অন্তত: এক চোক পানি পান করে হলেও [সেহরী করে], কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ সেহরীকারীদের ওপর সালাত পেশ করেন।”^{৪৪}

২. সেহরীকে বিলম্বিত করা মুস্তাহাব:

বর্ণিত আছে যে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেহরী ও ফজরের সালাতের মাঝে ৫০-৬০ আয়াত পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় যে সময়, সে সময়ের ব্যবধান ছিল।^{৪৫} আলেমগণ এই সময়কে প্রায় ৫ মিনিট বলে উল্লেখ করেছেন।

মাসআলা ১.১০.১ : জুমহরের মতে সেহরীর সময় মধ্যরাত্রে শুরু।

মাসআলা ১.১০.২ : সেহরী খাওয়া অবস্থায় আযান শুনলে করণীয়: হাদীসে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

^{৪৩} মুসলিম(১০৯৩)।

^{৪৪} আহমদ। আরনাউতের মতে সহীহ।

^{৪৫} বুখারী(৫৭৫) ও মুসলিম(১০৯৭)।

“পান্ন হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের কেউ আযান শুনলে সে যেন তা থেকে তার প্রয়োজন পূরণ করা পর্যন্ত তা না রাখে।”^{৪৬}

উপরোক্ত হাদীস প্রযোজ্য হবে যদি মুয়াযযিন ফজরের পূর্বেই আযান শুরু করেন। এজন্য জমহুরের মতে যদি আযান শ্রবণকারী নিশ্চিত হন যে মুয়াযযিন ফজর হলেই কেবল আযান দিয়ে থাকে, তবে তাকে তৎক্ষণাৎ পানাহার বন্ধ করতে হবে এবং মুখে কিছু থাকলে তা ফেলে দিতে হবে। কেননা আল্লাহ পাক বলেন:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْوَيْلِ

“আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর।”^{৪৭}

এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“বিলাল রাতেই আযান দেয়, অতএব ইবনে উস্লে মাকতুম আযান দেয়া পর্যন্ত পানাহার কর।”^{৪৮} হাদীসের এক ভাষ্যে এসেছে:

“আর সে [ইবনে উস্লে মাকতুম] ফজর না হলে আযান দেয় না।”^{৪৯}

^{৪৬} আহমদ, আবু দাউদ। আলবানীর মতে হাসান সহীহ, আরনাউতের মতে হাসান।

^{৪৭} সূরা আল বাকারা, ২ : ১৮৭।

^{৪৮} বুখারী(৬২২) ও মুসলিম(১০৯২)।

^{৪৯} বুখারী(১৯১৮)।

এ সমস্ত দলীলের মাঝে সমন্বয় সাধন করে আলেমগণ বলেছেন :

কেউ যদি ফজর হয়ে যাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হয়, তবে তার জন্য একটি লোকমা গলাধঃকরণ করাও বৈধ নয়। কিন্তু কেউ যদি এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়, তবে সে পানাহার করতে পারে। এজন্য নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বক্তব্য: “পান্ন হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের কেউ আযান শুনলে সে যেন তা থেকে তার প্রয়োজন পূরণ করা পর্যন্ত তা না রাখে।” প্রযোজ্য হবে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে:

১. যদি জানা থাকে যে মুয়াযযিন ফজরের আগেই আযান শুরু করেন।

২. মুয়াযযিন ফজরের পরেই আযান দেন কিনা - যদি এ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান না থাকে।

৩. যদি মুয়াযযিন ক্যালেন্ডারের অনুসরণে আযান দেন, কেননা ক্যালেন্ডারগুলোতে সাধারণত ফজরের শুরু কিছুটা আগেই দেখানো থাকে, আর তার কারণ এই যে ক্যালেন্ডার তৈরী করা হয় হিসাবের ভিত্তিতে, বাস্তবে ফজরের আলো দেখে নয়। তবে এক্ষেত্রে যদি জানা থাকে যে মুয়াযযিন ক্যালেন্ডারে উল্লেখিত সময়ের কিছুক্ষণ পর ফজরের শুরু নিশ্চিত হয়ে আযান দেন, তবে আযান শোনামাত্র পানাহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে।

উপরোল্লিখিত ৩টি ক্ষেত্রে আযান শোনার পর পান্নস্থিত খাবার শেষ করার অনুমতি থাকলেও আযান শোনামাত্র পানাহার সম্পূর্ণ বন্ধ করাটাই সর্বোত্তম, কেননা বর্তমান যুগে, বিশেষত: শহরাকূলে ফজরের শুরু সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

১.১১ সাওম ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্তসমূহ

১. ইসলাম। ২. বালগ হওয়া। ৩. আকুল থাকা। ৪. সামর্থ্য থাকা।

মাসআলা ১.১১.১: নাবালেগ শিশুকে সাওমের অভ্যাস করানো মুস্তাহাব। সাহাবীগণ হতে বর্ণিত যে তাঁরা তাঁদের শিশুদেরকে আশুরার সাওম অভ্যাস করাতেন এবং শিশুরা ক্ষুধায় কান্নাকাটি করলে তাদেরকে ভূলাতে খেলনা দিতেন।^{৫০}

মাসআলা ১.১১.২: চারটি লক্ষণের যেকোন একটি পাওয়া গেলে একজন ব্যক্তিকে বালেগ ধরতে হবে:

১. পরিতৃপ্তির সাথে বীর্যপাত হওয়া।
২. লজ্জাস্থানে লোম গজানো।
৩. ১৫ বৎসর পূর্ণ হয়ে ১৬তে পা দেয়া।
৪. হায়েয শুরু হওয়া [শুধুমাত্র নারীদের ক্ষেত্রে]।

মাসআলা ১.১১.৩: কোন ব্যক্তি যদি ফজরের পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময় উন্মাদ থাকে, তবে তাকে কাযা করতে হবে না, কেননা এ অবস্থায় তার ওপর সাওম ওয়াজিবই হয়নি।

মাসআলা ১.১১.৪: কোন ব্যক্তি যদি ফজরের পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময় বেহঁশ থাকে তবে তার জন্য সাওমের কাযা বাধ্যতামূলক হবে। কিন্তু যদি ফজর থেকে সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী অন্তত একটি মুহূর্তে তার জ্ঞান থেকে থাকে, তবে সাওম বিশুদ্ধ হবে।

মাসআলা ১.১১.৫: কেউ যদি সাওমের নিয়ত সহ ফজরের পূর্বে ঘুমায় এবং সূর্যাস্তের পরে জাগ্রত হয়, তবে তার সাওম বিশুদ্ধ। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে ঘুমিয়ে কোন ওয়াজের সালাত অতিক্রম করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়।

^{৫০} বুখারী(১৯৬০), মুসলিম(১১৩৬)।

১.১২ রামাদানের শুরু ও শেষ নির্ণয়

রামাদানের শুরু ও শেষ নির্ভর করবে চাঁদ দেখার ওপর। তবে শাবানের ২৯ তারিখের সূর্যাস্তের পর রামাদানের চাঁদ দেখা না গেলে শাবানকে ৩০ দিন ধরে পূর্ণ করতে হবে। এর সপক্ষে দলীল হল:

“তোমরা তা[চাঁদ] দেখে সাওম শুরু কর এবং তা[চাঁদ] দেখে সাওম শেষ কর, আর যদি তা তোমাদের নিকট অদৃশ্য হয় তবে শাবানের ৩০ দিন পূর্ণ কর।”^{৫১}

মাসআলা ১.১২.১: রামাদানের শুরু ও শেষ নির্ণয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোতে স্পষ্টত: “চাঁদ দেখা”র উল্লেখ এসেছে, অতএব চোখে দেখার ওপর ভিত্তি করে চাক্রমাসের শুরু ও শেষ নির্ধারিত হবে, অন্য কোনভাবে নয়। তবে দেখার ক্ষেত্রে টেলিস্কোপ জাতীয় যন্ত্র ব্যবহার করতে বাধা নেই।

মাসআলা ১.১২.২: রামাদানের শুরু নির্ণয়ের জন্য আস্থাভাজন একজন ব্যক্তির চাঁদ দেখার সাক্ষ্যই যথেষ্ট, এর দলীল হল:

ইবনে উম্মার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “লোকেরা নতুন চাঁদ খোঁজ করছিল, আমি আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানালাম যে আমি তা দেখেছি, অতঃপর তিনি সেদিন সাওম

^{৫১} বুখারী(১৯০৯), মুসলিম(১০৮১)।

পালন করলেন এবং লোকদেরকে সেদিনের সিয়ামের নির্দেশ দিলেন।”^{৫২}

মাসআলা ১.১২.৩: যদি একজন মাত্র ব্যক্তি চাঁদ দেখে, কিন্তু তার সাক্ষ্য গৃহীত না হয়, তবে তাকে একাকী সাওম পালন করতে হবে না, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“সাওম হল সেদিন যেদিন তোমরা [সকলে] সাওম পালন কর, আর ইফতার হল সেদিন যেদিন তোমরা [সকলে] ইফতার কর আর ‘আদহা’ হল সেদিন যেদিন তোমরা তোমাদের পশু যবেহ কর।”^{৫৩}

অর্থাৎ সাওম ও ঈদ জাতীয় অনুষ্ঠান একাকী নয়, মুসলিম জনগণের সাথে একত্রে পালন করতে হবে।

মাসআলা ১.১২.৪: রামাদানের শেষ এবং শাওয়ালের^{৫৪} শুরু নির্ণয়ের জন্য দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন। এর সপক্ষে দলীল হল, আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বক্তব্য:

“তোমরা তা[চাঁদ] দেখলে সাওম পালন কর এবং তা[চাঁদ] দেখলে সাওম ভঙ্গ কর এবং তদানুযায়ী ইবাদত পালন কর আর যদি

^{৫২} আবু দাউদ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

^{৫৩} তিরমিযী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

^{৫৪} শাওয়াল রামাদানের পরবর্তী মাস।

তোমাদের থেকে তা আড়াল হয় তবে ৩০ দিন পূর্ণ কর, আর যদি দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় তবে সাওম শুরু কর এবং ভঙ্গ কর।”^{৫৫}

এছাড়া এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে।

মাসআলা ১.১২.৫: যদি কেউ একাকী শাওয়ালের চাঁদ দেখে তবে সে সাওম ভঙ্গ করবে না, এর প্রমাণ হল উপরোক্ত হাদীসদ্বয়।

মাসআলা ১.১২.৬: যদি ২৮ দিন পর শাওয়ালের চাঁদ দেখা যায়, সেক্ষেত্রে বোঝা যাবে যে রামাদানের শুরু নির্ণয়ে ভুল হয়েছিল, তাই পরবর্তীতে একদিনের সাওম কাযা করে নিতে হবে, কেননা মাস কখনও ২৯ দিনের কম হওয়া সম্ভব নয়।

মাসআলা ১.১২.৭: কেউ যদি এক দেশে সাওম শুরু করার পর রামাদানের মাঝখানে অন্য দেশে যায়, তবে সে দ্বিতীয় দেশের লোকদের সাথে একই সময়ে সাওম শেষ করবে। তবে যদি সে দেশে রামাদান শেষ হওয়ার পূর্বেই তার ৩০টি সাওম পূর্ণ হয়, তবে সে সাওম ভঙ্গ করতে পারবে, কিন্তু তা জুনসমক্ষে করবে না, কেননা এতে ভুল ধারণা ও দ্বিধাদৃষ্টির সৃষ্টি হতে পারে। তেমনি যদি তার ২৯টি সাওম পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তাদের রামাদান শেষ হয়ে যায় তবে তাদের সাথেই সে রামাদান শেষ করবে, কিন্তু পরবর্তীতে একটি সাওমের কাযা আদায় করে নেবে।

১.১৩ যার পক্ষে চান্দ্রমাসের শুরু কিংবা শেষ নির্ণয় করা সম্ভব নয়

যদি কারও পক্ষে চান্দ্রমাসের শুরু কিংবা শেষ জানা সম্ভব না হয়^{৫৬}, তবে সে আনুজ করে সাওম পালন করবে। পরবর্তীতে যদি দেখা যায়

^{৫৫} আহমদ, নাসাঈ, অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

^{৫৬} যেমন ধরা যাক কোন অমুসলিম দেশে কারাবন্দী আসামীর ক্ষেত্রে।

যে সে সাওম গণনা শুরু করেছে প্রকৃত রামাদান শুরুর পরে, তবে তার সাওম আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে রামাদানের আগে শুরু করে থাকে, সেক্ষেত্রে রামাদানের পূর্বের সাওমগুলো নফল হিসেবে গণ্য হবে এবং তাকে পরবর্তীতে তা আদায় করতে হবে। কেননা প্রথম ক্ষেত্রে যে সাওমগুলো সে রামাদানের পরে পালন করেছে, সেগুলো কাযা হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রামাদানের পূর্বের সাওম দ্বারা তার ফরয সাওম আদায় হবে না, কেননা নির্ধারিত ওয়াক্তের পূর্বে পালনকৃত ইবাদত আদায় হয় না।

১.১৪ টাঁদ দেখা কি বিশ্বের সকলের জন্য একই না ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলভেদে ভিন্ন?

এ বিষয়ে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম আহমদের (র.) মতে কোন দেশে টাঁদ দেখা গেলে সকল মুসলিমের জন্য এর বিধান প্রযোজ্য হবে, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

“যখন তোমরা তা[টাঁদ] দেখতে পাও তখন সাওম শুরু কর এবং যখন তা[টাঁদ] দেখতে পাও সাওম শেষ কর।” কেননা এখানে সকল মুসলিমকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে চন্দ্রোদয়ের স্থানের পার্থক্য ধর্তব্য হবে না।

অপরপক্ষে ইমাম আশ-শাফিঈ এবং পূর্বযুগীয় অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণের মতে চন্দ্রোদয়ের স্থানের পার্থক্য ধর্তব্য হবে, আর হাদীসের সঙ্গোপন আপেক্ষিক, ফলে হাদীসের নির্দেশ সে সমস্ত অঞ্চলের লোকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করবে যেখানে টাঁদের অস্তিত্ব রয়েছে এবং সেসমস্ত অঞ্চলের লোকেরা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না যেখানে টাঁদের অস্তিত্ব নেই।

১.১৪.১ এ সম্পর্কে সৌদি বিশিষ্ট আলেমগণের কমিটির
() সিদ্ধান্তের সারমর্ম

❖ চন্দ্রোদয়ের স্থানের পার্থক্যের বিষয়টি ইন্ধিয় এবং যুক্তির দ্বারা অনিবার্যভাবে জ্ঞাত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত যার ব্যাপারে কেউ মতভেদ করেনি, তবে আলেমগণের মাঝে উদয়াচলের পার্থক্যের বিষয়টি ধর্তব্য হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য হয়েছে।

❖ চন্দ্রোদয়ের স্থানের পার্থক্য ধর্তব্য হওয়ার বিষয়টি গবেষণার জন্য উন্মুক্ত একটি মাসআলা যাতে ইজতিহাদের সুযোগ রয়েছে এবং এতে দ্বীনী আলেমগণের মাঝে মতপার্থক্য বিদ্যমান, আর তা গ্রহণযোগ্য মতপার্থক্যের অন্তর্গত, এই মাসআলায় আলেমগণ দুটি মতে বিভক্ত:

১. তাঁদের মাঝে কেউ উদয়াচলের পার্থক্যকে বিবেচ্য মনে করেছেন।

২. অন্যরা একে বিবেচ্য মনে করেননি।

এবং উভয় দলই কতিপয় দলীল ব্যবহার করেছেন।

❖ ইসলামের আবির্ভাবের পর ১৪ শতাব্দী গত হয়েছে অথচ আমরা এমন কোন সময়ের কথা জানি না, যখন একক টাঁদ দেখার ভিত্তিতে সকল মুসলিমের ঈদ একই দিনে পালিত হয়েছে। তাই এই কমিটির সিদ্ধান্ত হল: প্রত্যেক মুসলিম দেশ তার নিজস্ব আলেমগণের মাধ্যমে উপরোক্ত দুটি মতের যেকোনটি নির্বাচনের অধিকার রাখে।

ইবনে তায়মিয়া (র.) বলেন: সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণের ঐকমত্য অনুযায়ী উদয়াচলের পার্থক্য হয়ে থাকে, অতএব যদি তা [উদয়াচল] এক হয় তবে সাওম বাধ্যতামূলক হবে, আর না হলে নয় - এটাই শাফিঈ মায়হাবের সঠিক মত এবং হাম্বলী মায়হাবের একটি মত।

চন্দ্রোদয়ের স্থানের পার্থক্য বিবেচ্য হওয়ার সপক্ষে শক্তিশালী দলীল নিম্নোক্ত হাদীসটি:

কুরাইব থেকে বর্ণিত যে “উম্মুল ফাদল বিনতে আল-হারিস তাকে শাম্মে মুয়াবিয়ার (রা.) কাছে পাঠিয়েছিলেন, তিনি বলেন: আমি শাম্মে এসে তাঁর প্রয়োজন পূরণ করলাম আর শাম্মে থাকতে আমার রামাদান শুরু হল, এবং আমি জুম্ময়ার রাতে নতুন চাঁদ দেখলাম এরপর মাসের শেষে মদীনায় আসলে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আমাকে প্রশ্ন করলেন, এরপর নতুন চাঁদের উল্লেখ করলেন এবং বললেন তোমরা কবে চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম: আমরা জুম্ময়ার রাগ্নিতে তা দেখেছি। তিনি বললেন: তুমি নিজে তা দেখেছ? আমি বললাম: হাঁ, আর লোকেরাও দেখেছে ও সাওম পালন করেছে এবং মুয়াবিয়াও (রা.) সাওম পালন করেছেন। তিনি বললেন: কিন্তু আমরা তা শনিবার রাতে দেখেছি, সুতরাং আমরা ৩০দিন পূর্ণ করা কিংবা তা [শাওয়ালের চাঁদ] দেখা পর্যন্ত সাওম পালন করতে থাকব। আমি বললাম: আপনি কি মুয়াবিয়ার (রা.) চাঁদ দেখা ও তাঁর সাওম্লেই সীমাবদ্ধ থাকবেন না? তিনি বললেন: না। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে এমন নির্দেশই দিয়েছেন।^{৫৭}

^{৫৭} মুসলিম(১০৮৭), তিরমিযী(৬৯৩)।

১.১৪.২ এ সংস্পর্কে রাবেতার ইসলামী ফিকহ কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের সারমর্ম

❖ ইসলাম সহজতার ধর্ম, তাই তা চাঁদের ক্ষেত্রে চোখে দেখার নির্দেশ দিয়েছে এবং সহজতার জন্য চন্দ্রোদয়ের পার্থক্যকে বিবেচনায় এনেছে।

❖ সাওমের শুরু ও শেষ করার দিবসের ব্যাপারে সকল মুসলিমের একতাবদ্ধ হওয়ার বাধ্যবাধকতার দাবী শরীয়ত এবং যুক্তির দাবীর বিপরীত। এর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে তাঁরা [ফিকহ কাউন্সিল] উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং উদয়াচলের পার্থক্য থাকার ব্যাপারে জ্ঞানীদের ঐকমত্যের উল্লেখ করেন।

❖ প্রত্যেক মাযহাব থেকেই আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে অনেকের নিকটই চন্দ্রোদয়ের পার্থক্যকে বিবেচনায় আনার বিষয়টি অগ্রগণ্য। দূরবর্তী দেশের ক্ষেত্রে এক দেশের চাঁদ দেখা অপর দেশে বিবেচ্য না হওয়ার বিষয়ে ঈজমা রয়েছে বলে ইবনু আদ্দিন বার (র.) উল্লেখ করেছেন।

❖ মুসলিম উম্মাতের চাঁদ দেখা ও ঈদ উৎসবসমূহকে একদিনে করার দাবী অপ্রয়োজনীয়, কেননা ঈদের দিন এক হওয়া মুসলিম উম্মাতের একতাবদ্ধতার নিশ্চয়তা নয় - যেমনটি চাঁদ দেখা ও ঈদ উৎসব একদিনে করার প্রস্তাবকারীদের অনেকেই ভুলবশতঃ ধারণা করে থাকে। বরং চাঁদ দেখার বিষয়টি মুসলিম দেশগুলোর নিজ নিজ ফতোয়া ও আইন বিভাগের হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত, কেননা তা সার্বজনীন দুীনী কল্যাণের অধিক নিকটবর্তী। আর উম্মাতের একতাবদ্ধতার নিশ্চয়তা নিহিত রয়েছে সকল ক্ষেত্রে আল কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার মাঝে।

দ্রষ্টব্য: চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে তৃতীয় আরেকটি মত হল: এক্ষেত্রে মানুষ ইমাম তথা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের অনুসারী হবে, ফলে গোটা মুসলিম বিশ্বের শাসক একজন হলে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী সর্বত্র একই দিনে চান্দ্রমাসের শুরু হবে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে এই মতটি

অনসৃত হচ্ছে, কেননা বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে: কোন দেশে চাঁদ দেখা গেলে সে দেশের সকলেই সেই চাঁদ দেখার অনুসরণ করে থাকেন, এক্ষেত্রে বিষয়টি ভৌগোলিকভাবে না হয়ে রাজনৈতিকভাবে নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে একই দেশের অন্তর্গত লোকেরা সে দেশের সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চান্দ্রমাসের শুরুতে একই সময়সূচীর অনুসরণ করে থাকেন। উপরে বর্ণিত উদাহরণের পার্থক্যকে ধর্তব্যে আনার মতটি সঠিক হলেও মুসলিমদের ঐক্যের স্বার্থে বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতির বিরোধিতা করা অনুচিত।

সারমর্ম ও সিদ্ধান্ত: চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে আলেমগণের মাঝে তিনটি মত রয়েছে:

প্রথম মত: কোন অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে বিশ্বের সকল মুসলিম সেই দেশের অনুসরণ করবে।

দ্বিতীয় মত: কোন অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে বিশ্বের সেই সমস্ত অঞ্চলের লোকেরা তার অনুসরণ করবে যেসমস্ত অঞ্চলের উদয়াচল ঐ অঞ্চলের অনুরূপ।

তৃতীয় মত: কোন অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে ঐ অঞ্চলের শাসকের অধীনে যত স্থান আছে, তারা সবাই ঐ চাঁদ দেখার অনুসরণ করবে। দলীলের আলোকে বলা যায় যে উপরোক্ত দ্বিতীয় মতটি সঠিক, তবে বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে উপরোক্ত তৃতীয় মতটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এক্ষেত্রে দ্বিতীয় মতটিকে সঠিক বললেও মুসলিমদের কর্তব্য মুসলিম দেশের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আলেমগণের কমিটির^{৫৮} দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাগম শুরু ও শেষ করা। যেহেতু এ বিষয়ে ইজতিহাদ বা গবেষণাপ্রসূত মতপার্থক্যের সুযোগ রয়েছে, এজন্য মুসলিমদের ঐক্যের সার্থে নিজস্ব মতটিকে বিসর্জন দেয়া যেতে পারে, বরং এক্ষেত্রে প্রত্যেকে যেই মুসলিম সমাজে বসবাস করছে, সেই সমাজের ঐক্যকে বিনষ্ট না করাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

^{৫৮} যেমন আমাদের দেশের চাঁদ দেখা কমিটি।

মাসআলা ১.১৪.৩: অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলিমগণ সেখানকার ইসলামিক সেক্টার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুসরণ করবেন। এরকম কোন ইসলামিক সেক্টার না থাকলে সবচেয়ে নিকটবর্তী মুসলিম দেশের চাঁদ দেখার অনুসরণ করবেন।

অধ্যায় ২ : যাদের জন্য রামাদানের সাওমের ব্যাপারে সহজতা রয়েছে।

চার শ্রেণীর ব্যক্তির জন্য রামাদানের সাওমের ব্যাপারে সহজতা রয়েছে :

১. অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফির।
২. হায়েয ও নিফাস অবস্থায় নারী।
৩. গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী।
৪. বার্ধক্য কিংবা আরোগ্যের আশাহীন রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে অক্ষম ব্যক্তি।

২.১ অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফির

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য অসুস্থতার সময় এবং মুসাফিরের জন্য সফর অবস্থায় রামাদানের সাওম ভঙ্গ করার অনুমতি রয়েছে। তবে পরবর্তীতে তা আদায় করে নিতে হবে। আল্লাহ পাক বলেন :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا

يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا

هَدَلَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٥﴾

“রামাদান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের সহজতা চান এবং কাঠিন্য চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হেদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর।”^{৫৫}

২.১.১ অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থাতেই তার জন্য সাওমের বিধান

ক. সামান্য অসুস্থতা, যার ওপর সাওমের কোন প্রভাব নেই, যেমন: সামান্য ঠান্ডা কিংবা মাথাব্যথা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সাওম ভঙ্গ করা বৈধ নয়।

খ. এমন অসুস্থতা যে সাওম পালন করলে তা কষ্টকর হবে, এক্ষেত্রে সাওম পালন করা মাকরুহ এবং সাওম ভঙ্গ করা মুস্তাহাব। কেননা উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন: “আল্লাহ তোমাদের সহজতা চান এবং কাঠিন্য চান না।” এছাড়া ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“আল্লাহ পাক যেমন তাঁর নির্দেশগুলো পালিত হওয়া পছন্দ করেন, তেমনি তাঁর রুখসাতগুলো^{৫৬} গৃহীত হওয়াকে পছন্দ করেন।”^{৫৭}

^{৫৫} সূরা আল বাক্বারা, ২ : ১৮৫।

^{৫৬} রুখসাত অর্থ ছাড় বা সহজতা।

গ. যদি সাপ্তমের কারণে রোগীর ক্ষতি বা রোগবৃদ্ধির আশংকা থাকে তবে এক্ষেত্রে তার জন্য সাপ্তম পালন করা নিষিদ্ধ, কেননা আল্লাহ পাক বলেন:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

“আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না।”^{৬২}

وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“এবং নিজ হাতে নিজদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।”^{৬৩}

২.১.২ মুসাফিরের অবস্থাত্তে তার জন্য সাপ্তমের বিধান

ক. আরামদায়ক সফরেও সাপ্তম ভঙ্গ করার অনুমতি রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সাপ্তম পালন করাই উত্তম কেননা:

❖ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরে সাপ্তম পালন করতেন এবং অন্যকে অনুমতি দিয়েছেন:

”

আবু আদ-দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমরা রামাদান মাসে প্রচন্ড গরমের মধ্যে আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে সফরে বের হলাম, এমনকি আমাদের কাউকে প্রচন্ড গরমের কারণে নিজের মাথায় হাত রাখতে হিচ্ছিল, আর আমাদের

^{৬২} বাযযার, তাবারানী, ইবনু হিব্বান। আলবানীর মতে সহীহ।

^{৬৩} সূরা আন নিসা, ৪ : ২৯।

^{৬৩} সূরা আল বাক্বারা, ২ : ১৯৫।

মাঝে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.) ছাড়া আর কোন রোযাদার ছিল না।”^{৬৪}

» -

«

হামযা বিন আমর আল-আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি সফরে সাওম পালনের সামর্থ্য অনুভব করি, আমার কি প্তনাহ হবে?” আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: “এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সহজতা, যে তা গ্রহণ করল, তা উত্তম। আর যে সাওম পালন করতে চায় তার কোন প্তনাহ নেই।”^{৬৫}

❖ এক্ষেত্রে সাওম পালন করা উত্তম এজন্য যে এর ফলে দ্রুত ফরয আদায় হল।

❖ রোযাদারের জন্যও তা সহজ, কেননা পরবর্তীতে একাকী কাযা আদায় করার চেয়ে রামাদানে অন্যদের সাথে সাওম পালন সহজতর।

❖ এক্ষেত্রে ফযীলতপূর্ণ সময় তথা রামাদানেই সাওম পালন করা সম্ভব হল, কেননা অন্য সময়ের মর্যাদা রামাদানের অনুরূপ নয়।

খ. যদি সফরের কারণে সাওম ভঙ্গ করা মুসাফিরের জন্য আরামদায়ক ও সহজ হয়, আর সাওম কৰ্ফকর হয় তবে সাওম ভঙ্গ করাই উত্তম, কেননা এক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত সহজতা গ্রহণ করাই ভাল।

^{৬৪} বুখারী(১৯৪৫), মুসলিম(১১২২)।

^{৬৫} মুসলিম(১১২১)।

গ. যদি সফরের কারণে মুসাফিরের সাওম পালনে অত্যধিক কষ্ট হয়, তবে সাওম পালন করা তার জন্য বিধিদ্ধ। এর সপক্ষে দলীল নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ:

" . "

জাবির বিন আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে “আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের বছর রামাদানে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং সাওম পালন করেন, অবশেষে তিনি ‘কুরা আল-গামীম’ নামক স্থানে পৌঁছালেন, আর লোকেরাও সাওম পালন করছিল, এরপর তিনি পানির একটি পাত্র আনতে বললেন এবং তা ঠুঁচু করে ধরলেন যেন লোকেরা তা দেখতে পায়, এরপর পান করলেন। পরবর্তীতে তাঁকে বলা হল যে কিছু লোক সাওম পালন করেছে, তিনি বললেন: “ওরাই অব্যাহত, ওরাই অব্যাহত।” এক বর্ণনায় এসেছে: তাঁকে বলা হল যে লোকেদের জন্য সিয়াম কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে, আপনি কি করেন, তারা তার অপেক্ষায় আছে, ফলে তিনি আসরের পর একটি পানির পাত্র আনতে বললেন এবং পান করলেন।”^{৩৩}

^{৩৩} মুসলিম(১১১৪)।

জাবির বিন আদ্দিলাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরে থাকা অবস্থায় লোকেদের ভিড় দেখলেন এবং একজন লোক দেখলেন যার ওপর ছায়া দিয়ে রাখা হয়েছে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: “এটা কি?” তারা বলল: “সাপ্তম পালনকারী” তিনি বললেন: “সফরে সাপ্তম পালন কোন উত্তম কাজ নয়”^{৫৭}।^{৫৮}

মাসআলা ২.১.২.১: মুসাফিরের জন্য সাপ্তম ভঙ্গ করা বৈধ, যদিও বা সফর আরামদায়ক কিংবা সংক্ষিপ্ত হয়, তবে শর্ত হচ্ছে সেই ভ্রমণ এমন হতে হবে যাকে মানুষ সফর বলে।^{৫৯}

^{৫৭} অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় এত কষ্ট করে সাপ্তম পালন করা কোন ভাল কাজ নয়, বরং এক্ষেত্রে সাপ্তম ভঙ্গ করাই কর্তব্য।

^{৫৮} বুখারী(১৯৪৬), মুসলিম(১১১৫)।

^{৫৯} এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে সালাত সংক্ষিপ্ত করা কিংবা সাপ্তম ভঙ্গ করা জাতীয় সুবিধাদি কোন সফরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অর্থাৎ এর “দূরত্ব বা সময়ের পরিমাণ কি?” এর জবাবে সঠিক মত হচ্ছে এই যে যাকে প্রথাগতভাবে সফর বলা যায়, সেটাই সফর হিসেবে গণ্য হবে, কেননা এর দূরত্ব কিংবা সময়কালের ব্যাপারে শরীয়তে কোন সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি। আর এক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হল: শরীয়তে উল্লেখিত কোন বিষয়ের সংজ্ঞা যদি শরীয়তে নির্ধারণ করে দেয়া না হয়, আর ভাষাগতভাবেও তার কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকে, তবে তার সংজ্ঞা নির্ধারিত হবে প্রথা অনুযায়ী। যেমন: শরীয়তে সফরের উল্লেখ এসেছে কিন্তু এর জন্য কোন দূরত্ব বা সময় নির্ধারিত হয়নি, আর ভাষাগত দিক থেকেও “সফর” এর কোন নির্দিষ্ট দূরত্ব কিংবা সময় নির্ধারিত নেই, আর তাই প্রচলিত প্রথায় যাকে সফর হিসেবে উল্লেখ করা যায়, সেটাই সফর বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে সাহাবীগণের নিকট থেকে যে দূরত্ব কিংবা সময়ের সীমার বর্ণনা পাওয়া যায়, তাকে তৎকালীন সময়ের জন্য প্রযোজ্য সফরের প্রচলিত সংজ্ঞা হিসেবে গণ্য করতে হবে, বর্তমানেও সফরের প্রচলিত সংজ্ঞা একই হবে - এমন কোন কথা নেই।

মাসআলা ২.১.২.২: মুসাফির সাওম ভঙ্গ করতে পারবে নিজ এলাকা থেকে বের হওয়ার পর, কেননা এর পূর্বের অবস্থাকে সফর বলা যায় না। সালাত সংক্ষিপ্ত করার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি পেনে বিদেশ ভ্রমণ করে, তবে পেন আকাশে ওড়ার পর সে সাওম ভঙ্গ করবে, দিনের শুরু থেকেই নয়।

২.২ হায়েয ও নিকাস অবস্থায় নারী

এ অবস্থায় নারীর জন্য সাওম পালন করা বৈধ নয়, এবং সাওম পালন করলে তা আদায় হবে না, বরং তাকে সাওম পালন থেকে বিরত থাকতে হবে এবং পরবর্তীতে তা আদায় করতে হবে। হাদীসে বর্ণিত:

মুয়াযা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “আমি আয়শাকে (রা.) জিজ্ঞেস করলাম যে হায়েয অবস্থায় নারীর বিষয়টি কেমন যে সে সাওমের কাযা আদায় করে কিন্তু সালাতের কাযা আদায় করে না?” তিনি [আয়শা (রা.)] বললেন “তুমি কি ‘হারুরিয়্যা’^{৯০}?” আমি বললাম: “‘হারুরিয়্যা’ নই, তবে জানতে চাচ্ছি।” তিনি [আয়শা (রা.)] বললেন: “আমাদেরও তা হত, ফলে আমাদেরকে সাওমের কাযা আদায়ের নির্দেশ দেয়া হত, আর সালাতের কাযা আদায়ের নির্দেশ দেয়া হত না।”^{৯১}

^{৯০} খারিজীদের একটি দল, তারা হায়েয আক্রান্ত নারীদেরকে সালাতের কাযা আদায়ের নির্দেশ দিত।

^{৯১} বুখারী(৩২১), মুসলিম(৩৩৫)।

হায়েয ও নিফাস অবস্থায় নারীর সাওম আদায় না হওয়া এবং এর কাযা আদায় বাধ্যতামূলক হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে।

২.৩ গর্ভবতী এবং স্তন্যদাত্রী

যদি গর্ভবতী কিংবা স্তন্যদাত্রীর সাওমের কারণে নিজের কিংবা সন্তানের ক্ষতির আশংকা থাকে তবে তাদের জন্য সাওম ভঙ্গ করা এবং পরবর্তীতে তা আদায় করা বৈধ।^{৯২} এর দলীল হল অসুস্থ ও মুসাফিরের বিধানের সাথে কিয়াস() বা তুলনা এবং নিম্নোক্ত হাদীস:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ মুসাফিরের জন্য সাওম এবং সালাতের অর্ধেক লাঘব করেছেন এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রীর জন্যও।”^{৯৩}

তবে তারা যদি সাওম পালন করে, তবে তা আদায় হয়ে যাবে।

২.৪ বার্বক্য কিংবা স্থায়ী অসুস্থতার কারণে অক্ষম ব্যক্তি

বার্বক্যের কারণে কিংবা আরোগ্যের আশা নেই - এমন রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে অক্ষম ব্যক্তি প্রতিদিনের সাওমের পরিবর্তে একজন মিসকীন^{৯৪} খাওয়াবেন। ইবনে আব্বাস (রা.) “...আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদয়া - একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান

^{৯২} বরং ক্ষতির আশংকা প্রবল বলে হলে সাওম ভঙ্গ করা বাধ্যতামূলক হবে।

^{৯৩} আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ এবং অন্যান্য। আলবানী ও আরনাউট এর মতে হাসান।

^{৯৪} মিসকীন এমন ব্যক্তি যার উপার্জনে তার জন্য যথেষ্ট হয় না।

করা।...^{৭৫} আয়াতটি সম্পর্কে বলেন যে আয়াতটি মানসূখ নয়, বরং তা এমন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার জন্য প্রযোজ্য হবে যারা সাওম পালনে সক্ষম নয়।^{৭৬}

মাসআলা ২.৪.১ : বার্ষিক্য কিংবা দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়ার কারণে অক্ষম ব্যক্তি প্রতিদিনের সাওমের পরিবর্তে একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন। রান্না করে খাওয়ানো যেতে পারে, কেননা আল- কুরআনে ইঁতআম() তথা “খাওয়ানোর” কথা এসেছে। অথবা তাদের প্রত্যেককে অর্ধেক সা’ () [প্রায় ১.৫ কেজি]^{৭৭} পরিমাণ চাল বা অনুরূপ খাদ্য [যা ঐ দেশের মানুষ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে] দেয়া যাবে, আর এক্ষেত্রে সাথে খাওয়ার জন্য সজ্জি, ডাল বা মাংস জাতীয় কিছু দেয়াটা মুস্তাহাব বা উত্তম। সাওমের ফিদয়ার ক্ষেত্রে অর্ধেক সা’ - এর বিবরণ সরাসরি আসেনি, বরং ইঁহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদনকারীর ফিদয়ার পরিমাণের সাথে কিয়াস বা তুলনা করে তা নির্ণয় করা হয়েছে। ইঁহরাম অবস্থায় মাথার চুল মুণ্ডনকারী ব্যক্তির প্রতি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছিলেন:

^{৭৫} সূরা আল বাকারা, ২ : ১৮৪। এই আয়াতটি প্রাথমিকভাবে নাযিল হয়েছিল সাওম পালন এবং মিসকীন খাওয়ানোর মধ্যে যে কোনটি করার অনুমোদন দিয়ে। পরবর্তীতে সামর্থ্যবানদের জন্য মিসকীন খাওয়ানোর বিধান রোহিত হয়ে যায়, আর তা বিদ্যমান থাকে বার্ষিক্যের কারণে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য যেমনটি ইঁবনে আব্বাস(রা.) ব্যাখ্যা করেছেন।

^{৭৬} বুখারী(৪৫০৫)।

^{৭৭} সা’ আয়তনের একক, যার পরিমাণ চার মুদ্ধ। এক মুদ্ধ হল দুই হাতের এক আঁজনা। এজন্য ওজনের এককে সা’ এর পরিমাণ সুনির্দিষ্ট নয়, পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ এক সা’ আয়তনের কোন শস্যের ওজন কত, তা নির্ভর করবে ঐ শস্যের ওপর, যেমন: এক সা’ চাল আর এক সা’ গমের ওজন ভিন্ন হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে এক সা’কে ৩কেজি হিসেবে গণ্য করার বিষয়টি কিছুটা অনুমানভিত্তিক, তবে এই অনুমানে যেন শস্যের পার্থক্যভেদে কমতি না হয়ে যায়, এজন্য বাড়িয়ে ৩কেজি ধরা হয়েছে। আর এজন্যই সা’ এর পরিমাপের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন ওজন পাওয়া যেতে পারে। মোটকথা এই ওজন অনুমানভিত্তিক ও শস্যভেদে ভিন্ন হওয়ায় একে বাড়িয়ে ৩কেজি ধরে নেয়াই নিরাপদ।

“...অথবা প্রতি মিসকীনের জন্য অর্ধেক সা’ হিসেবে ছয়জন মিসকীনকে খাওয়াও।”^{৭৮}

মাসআলা ২.৪.২: বার্ষিকের কারণে অক্ষম কিংবা আরোগ্যের আশাহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি মিসকীন খাওয়ানোর সামর্থ্য না থাকে, তবে তার অপর কোন দায়িত্ব নেই এবং তাকে পরবর্তীতেও আর কিছু করতে হবে না।

মাসআলা ২.৪.৩: একজন ব্যক্তিকে ৩০টি সাওমের ফিদয়া দেয়া যাবে।

মাসআলা ২.৪.৪: ফিদয়া অগ্রিম দেয়া যাবে না, কেননা অগ্রিম ফিদয়া দেয়া ওয়াস্তের পূর্বে ইবাদত পালনের মত - যা কিনা বিস্তৃত নয়।

২.৫ ইচ্ছাকৃতভাবে সাওম পরিত্যাগ করা

পূর্বোল্লিখিত ওজরগুলোর কোনটি ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে সাওম পরিত্যাগ করা অত্যন্ত বড় গুনাহের কাজ এবং এই পাপকাজ সম্পাদনকারীকে খাঁটি মনে আল্লাহর নিকট তওবা করতে হবে। যদি সে সাওম শুরুই না করে, তবে তার কোন কাযা নেই, কেননা সাওম নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত ইবাদত, সেই সময় অতিক্রান্ত হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আর যদি কেউ ফরয সাওম শুরু করে বিনা কারণে তা ভেঙ্গে ফেলে তবে তওবার পাশাপাশি তা পরবর্তীতে আদায় করতে হবে, কেননা ফরয ইবাদত শুরু করলে তা পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, তাই এক্ষেত্রে তা মানতের মত, যা পূরণ করতে মানতকারী বাধ্য।

^{৭৮} বুখারী(১৮১৬), মুসলিম(১২০১)।

আর এজন্যই রামাদানের দিবসে স্ত্রীর সাথে মিলিত ব্যক্তিকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাফফারা দেয়ার পাশাপাশি কাযা আদায়ের নির্দেশও দিয়েছিলেন:

“তার পরিবর্তে একদিন সাওম পালন কর।”^{৭৯}

মাসআলা ২.৫.১: কেউ যদি স্ত্রীর সাথে সংগমের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে তার সাওম ভঙ্গ করে, তবে কাযার পাশাপাশি তাকে কাফফারা দিতে হবে। এর বিবরণ সামনে আসছে।

মাসআলা ২.৫.২: যার ওপর রামাদানের সাওম বাধ্যতামূলক অথচ সে কোন কারণে ইঁফতার করে ফেলল, জানা বা স্মরণ হওয়া মাত্র তাকে বিরত হতে হবে - এটা প্রায় সকল আলেমের মত। যেমন:

- ❖ বিনা ওজরে সাওম ভঙ্গকারী। তার সাওম ভঙ্গ হলেও বাকী দিন পানাহার থেকে বিরত থাকা তার জন্য বাধ্যতামূলক এবং পরবর্তীতে কাযা আদায়ও বাধ্যতামূলক।
- ❖ যে ফজর হয়নি ভেবে খাওয়া চালিয়ে গিয়েছে। সে ফজর হয়েছে জানা মাত্র তাকে বিরত হতে হবে এবং তার সাওম হয়ে যাবে।
- ❖ যে সূর্যাস্ত হয়েছে ভেবে ইঁফতার করে ফেলেছে। সে সূর্যাস্ত হয়নি জানামাত্র বিরত হবে এবং তার সাওম হয়ে যাবে।
- ❖ যে দিনের বেলায় রামাদান শুরু সংবাদ পেয়েছে। সে সংবাদ পাওয়া মাত্র বিরত হবে, কেননা তা রামাদানের একটি দিন। আর পরবর্তীতে তাকে কাযা করতে হবে, কেননা ঐদিনের শুরু থেকে তার সাওমের নিয়ত ছিল না।

^{৭৯} ইবনে মাজাহ(১৩৭১)। আলবানীর মতে সহীহ।

২.৬ কাযা আদায়ের সময়

পরবর্তী রামাদানের পূর্বেই পূর্ববর্তী রামাদানের কাযা আদায় করতে হবে, কেননা বিনা ওজরে একটি ফরযকে পরবর্তী ফরযের ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করা বৈধ নয়। এছাড়া হাদীসে আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

“আম্মার ওপর রামাদানের সাওম থাকা সত্ত্বেও আমি শাবান ছাড়া তার কাযা আদায় করতে পারতাম না।”^{b০} কেননা তিনি নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খেদমতে নিয়জিত থাকতেন, আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“স্বামী উপস্থিত থাকলে তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন নারীর জন্য সাওম পালন জায়েয নয়।”^{b১} কেননা এক্ষেত্রে স্বামীর উপভোগের জন্য প্রস্তুত থাকা স্বীর ওপর ওয়াজিব যা নফল সাওমের ওপর প্রাধান্য পাবে। আর যদি সেই সাওম রামাদানের কাযা হয়, তবে পরবর্তী রামাদানের পূর্ব পর্যন্ত তা আদায়ের সুযোগ থাকায় এক্ষেত্রেও স্বামীর প্রয়োজন প্রাধান্য পাবে। তবে রামাদানের সাওমের ক্ষেত্রে উপরোক্ত হাদীস প্রযোজ্য নয়।

যদি কোন ব্যক্তির কাযা আদায়ের পূর্বেই পরবর্তী রামাদান চলে আসে, তবে প্রত্যেক সাওমের সাথে একজন করে মিসকীন খাওয়াতে হবে: ইবনে আব্বাস, ইবনে উম্মার ও আবু হুরায়রা (রা.) এমন

^{b০} বুখারী(৫১৯৫), মুসলিম(১০২৬)।

^{b১} বুখারী(১৯৫০), মুসলিম(১১৪৬)।

নির্দেশ দিতেন বলে বর্ণিত আছে।^{৮২} তবে তাঁদের এ নির্দেশ এ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতের বাহ্যিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় এবং এই মতের সপক্ষে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূন্নাতে কোন স্পষ্ট প্রমাণ না থাকায় ধরতে হবে যে তাঁরা এরূপ ব্যক্তির ওপর কর্তৃত্ব আরোপ করার জন্য নিজস্ব ইজ্তিহাদের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, আর তাই সাওমের সাথে মিসকীন খাওয়ানোর বিষয়টিকে ওয়াজিব বলা যায় না।

মাসআলা ২.৬.১: কাযা সাওম আদায়ের পূর্বে নফল সাওম পালন করা জায়েয।

মাসআলা ২.৬.২: কেউ যদি গ্রহণযোগ্য কোন কারণে কাযা আদায়ের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তবে তার পক্ষ থেকে কিছু করতে হবে না, কেননা সামর্থ্য না থাকলে কোন বিধানের বাধ্যবাধকতা অপসৃত হয়।

মাসআলা ২.৬.৩: কেউ যদি অবহেলার কারণে কাযা আদায়ের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তবে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য তার পক্ষ থেকে সাওম পালন করা মুস্তাহাব, কেননা নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“পালনীয় সিয়াম রেখে যে মারা গেল, তার ওলী^{৮৩} তার পক্ষে সাওম পালন করবে।”^{৮৪}

উত্তরাধিকারী ছাড়া অন্য কেউ সাওম পালন করলেও তা আদায় হবে।

^{৮২} আব্দুর রায়যাক, দারাকুতনী, বায়হাকী এ সংক্রান্ত বর্ণনা সহীহ সনদে লিপিবদ্ধ করেছেন।

^{৮৩} এখানে ওলী দ্বারা উদ্দেশ্য ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী।

^{৮৪} বুখারী(১৯৫২), মুসলিম(১১৪৭)।

অধ্যায় ৩ : সাওম ভঙ্গকারী বিষয়

৩.১ পানাহার

স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে পানাহারের ফলে সাওম ভঙ্গ হয়, কেননা আল্লাহ পাক বলেন:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْوَيْلِ

“...আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর।...”^{৮৫}

মাসআলা ৩.১.১: ধূমপানও পানের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য যে ধূমপান সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ।

মাসআলা ৩.১.২: নাকের ছিদ্র দিয়ে কোন কিছু গলায় কিংবা পাকস্থলীতে পৌঁছালে সাওম ভঙ্গ হয়, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

^{৮৫} সূরা আন বাকারা, ২ : ১৮৭।

“ওযু পরিপূর্ণ কর, আঙ্গুলের মাঝে খিলাল কর এবং রোযাদার না হলে নাকে বেশী করে পানি টেনে নাও।”^{৮৬}

অতএব নাকের ড্রপ ব্যবহার করার ফলে তা গলায় বা পাকস্থলীতে পৌঁছালে সাওম ভঙ্গ হবে। তাই রোযাদারের জন্য নাকের ড্রপ ব্যবহার করা বৈধ নয়। তবে যদি তা সামান্য হয় যা গলায় পৌঁছায় না এবং তা ব্যবহার না করা রোযাদারের জন্য কষ্টের কারণ হয়, তবে তা ব্যবহার করা যেতে পারে, এক্ষেত্রে তা মুখে পৌঁছুলে গেলা যাবে না, যদি গিলে ফেলে, তবে সাওম ভঙ্গ হবে এবং কাযা বাধ্যতামূলক হবে।

মাসআলা ৩.১.৩ : যদি জানা থাকে যে নাকের ড্রপ গলায় পৌঁছাবে, তবে তা ব্যবহার করা বৈধ নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে যদি তার অসুস্থতা এমন পর্যায়ের হয় যে তার জন্য সাওম ভঙ্গ করা বৈধ, তবে সে সাওম ভঙ্গ করে ঐ ড্রপ ব্যবহার করতে পারবে এবং পরবর্তীতে কাযা আদায় করবে।

যে সমস্ত কাজের দ্বারা পানাহারের উদ্দেশ্য সাধিত হয়, অর্থাৎ যা পানাহারের বিকল্প - সে কাজগুলোও সাওম ভঙ্গকারী। এর কিছু উদাহরণ হল:

ক. ইনজেকশনের মাধ্যমে শক্তিবর্ধক কিছু প্রবেশ করানো।

খ. রক্ত গ্রহণ করা।

গ. কিডনী ডায়ালাইসিসের সময় রক্ত পরিবর্তন কিংবা রক্তে শক্তিবর্ধক কোন বস্তু যুক্ত করা। তবে কিডনী ডায়ালাইসিসের সময় যদি শুধুমাত্র রক্তকে পরিষ্কার করা হয় এবং এতে শক্তিবর্ধক দ্রব্য কিংবা নতুন রক্ত যোগ করা না হয়, তবে সাওম ভঙ্গ হবে না।

^{৮৬} আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ। আলবানীর মতে সহীহ।

নীচের বিষয়গুলো সাওম ভঙ্গকারী নয়:

ক. চোখ বা কানের ড্রপ।

খ. লজ্জাস্থান দিয়ে দেহে কোন কিছু প্রবেশ করানো [যেমন: সাপোজিটরী]। তবে তা শক্তিবর্ধক হলে সাওম ভঙ্গ হবে।

গ. ইনহেলার বা অক্সিজেন গ্রহণ। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ।

ঘ. মিসওয়াক, টুথব্রাশ বা পেপ্ট ব্যবহার অথবা দাঁত ফিলিং করা। তবে এক্ষেত্রে কোন কিছু গলাধঃকরণ পরিহার করতে হবে।

ঙ. দেহের কোন অংশে ক্যাথেটার কিংবা ক্যামেরা প্রবেশ করানো, যদিও বা তা মুখ দিয়েও হয়। কেননা তা পানাহার কিংবা এর বিকল্প কিছু নয়।

চ. ক্রীম, তেল, মেকআপ, লিপস্টিক, ঠোঁট আদ্রকারী দ্রব্য, সুগন্ধী ইত্যাদির ব্যবহার।

ছ. মুখের লালা কিংবা সর্দি গিলে ফেলা।

জ. কিছু বন্ধব্যূধির ঔষধ আছে যা জিহ্বার নিচে রাখা হয়, এই ধরনের ঔষধের কোন অংশ গিলে না ফেললে তা মুখে রাখা সাওম ভঙ্গকারী নয়।

ঝ. কুলি করা, গোসল করা যদিও বা শুধুমাত্র আরামের উদ্দেশ্যে হয়, সাঁতার কাটা ও পানিতে ডুব দেয়া - তবে এর কোনটির ক্ষেত্রে পানি পেটে প্রবেশ করার আশংকা হলে তা বৈধ নয়।

মাসআলা ৩.১.৪: প্রয়োজনে জিহ্বায় স্পর্শ করিয়ে খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করা জায়েয। যেমন: বাবুর্চির জন্য, কিংবা মা যদি শিশুর খাবার চিবিয়ে নরম করে দিতে চায়। তবে খাদ্যের কোন অংশ গেলা যাবে না।

মাসআলা ৩.১.৫: সাওম অবস্থায় কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত করা মাকরুহ। তবে কেউ যদি তা করে এবং অনিচ্ছায় পানি পেটে চলে যায়, তবে সাওম ভঙ্গ হবে না, কেননা সে ইচ্ছাকৃতভাবে তা করেনি। তেমনি গোসল, সাঁতার কিংবা ডুব দেয়ার ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃতভাবে পেটে পানি চলে গেলেও সাওম ভঙ্গ হবে না।

৩.১.৬ অ্যাজমা, হাঁপানী প্রভৃতি রোগের জন্য ব্যবহৃত কতিপয় চিকিৎসা ও তার বিধান

ক. চাপের মাধ্যমে গ্যাসীয় পদার্থ নির্গতকারী ইনহেলার: এর দ্বারা সাওম ভঙ্গ হয় না, কেননা তা গ্রহণ করা পানাহার কিংবা এর বিকল্প নয়, এছাড়া ইনহেলারে ব্যবহৃত দ্রব্যের কোন অংশ পাকস্থলীতে পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত নয়, এক্ষেত্রে সন্দেশের দ্বারা নিশ্চিততা বাতিল হবে না, আর এক্ষেত্রে সাওমের বিষয়টি নিশ্চিত। আর যদি ধরেও নেয়া হয় যে এই দ্রব্যের কিছু অংশ পাকস্থলীতে পৌঁছে থাকতে পারে, তবে তা এত সামান্য যে তা উপেক্ষার যোগ্য, যেমনিভাবে কুলি করার পর অবশিষ্ট পানি কিংবা মিসওয়াকে বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান উপেক্ষার যোগ্য।

খ. অক্সিজেন গ্রহণ: অক্সিজেন গ্রহণ পানাহার নয়, পানাহারের বিকল্পও নয়, অতএব তা সাওম ভঙ্গকারী নয়।

গ. ক্যাপসুল চূর্ণকারী ইনহেলার: এ ধরনের ইনহেলার সাওম ভঙ্গকারী, কেননা এই ক্যাপসুলের চূর্ণ পাকস্থলীতে পৌঁছুতে পারে।

ঘ. নেবুলাইজার: নেবুলাইজার ব্যবহারে স্যালাইনের সূক্ষ্ম বাষ্প পেটে পৌঁছানো প্রায় নিশ্চিত যা প্রতিহত করা রোগীর পক্ষে সম্ভব নয়, আর তাই নেবুলাইজার ব্যবহারে সাওম ভঙ্গ হবে।

৩.২. বমি

এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত:

“যার বমি হয়ে যায় তারা কাযা করতে হবে না, আর যে বমির উদ্বেক করল, তার কাযা করতে হবে।”^{৮৭}

^{৮৭} আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ। আনবানীর মতে সহীহ।

এ হাদীসটির বিশুদ্ধতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমদ, বুখারী, তিরমিযী, ইবনুল কায়্যিম (র.) প্রমুখের মতে হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। আবার ইবন হিব্বান, হাকিম, যাহাবী (র.) প্রমুখ একে সহীহ বলেছেন। আলবানীর মতেও হাদীসটি সহীহ।

অতএব এই হাদীস অনুযায়ী কেউ যদি গলায় আঙ্গুল দিয়ে কিংবা পেট চেপে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্গন্ধ নিয়ে অথবা নোংরা কিছুর দিকে তাকিয়ে বমি করে, তবে তার সাওম ভঙ্গ হবে, বমি অল্প হোক বা অধিক হোক। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে বমির ক্ষেত্রে সাওম ভঙ্গ হবে না।

মাসআলা ৩.২.১: যদি কারও বমি আসে, তবে সে নিজেকে বিরত করার চেষ্টা করবে না, কেননা তা তার জন্য ক্লান্তিকর।

৩.৩ দৈহিক সম্পর্ক

দৈহিক সম্পর্কের দ্বারা সাওম ভঙ্গ হয় এবং কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হয়। এছাড়া তাকে এই গর্হিত কাজের জন্য তওবা করতে হবে। এই কাফফারার বর্ণনা এসেছে নিম্নলিখিত হাদীসে:

আবু হরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে বসা ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি ধ্বংস হয়েছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমার কি হয়েছে? সে বলল: রোযাদার অবস্থায় আমার স্বীর সাথে মিলিত হয়েছি। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: [মুক্ত করার মত] তোমার কি কোন দাস আছে? সে বলল: না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তবে কি একটানা দুমাস রোযা রাখতে পারবে? সে বলল: না। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তবে কি ষাটজন মিসকীন খাওয়াতে পারবে? সে বলল: না। তিনি [আবু হরায়রা (রা.)] বললেন: এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছু সময় পার করলেন, আমরা এভাবে থাকা অবস্থাতেই নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে খেজুরপূর্ণ একটি ঝুড়ি আনা হল, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল: আমি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন এটা নাও, এ দিয়ে সাদাকা কর। অতঃপর লোকটি বলল: “আমার চেয়েও দরিদ্র কাউকে হে আল্লাহর রাসূল? আল্লাহর শপথ এর দুই লাভা-ভূমির মাঝে^{৮৮} আমার ঘরওয়ালাদের চেয়ে দরিদ্র কোন ঘরওয়ালা নেই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেসে উঠলেন, এমনকি তাঁর স্বদন্ত প্রকাশ পেল, এরপর বললেন: তোমার পরিবারকেই তা খাওয়াও।^{৮৯}

^{৮৮} অর্থাৎ মদীনায়, কেননা মদীনা দুই লাভাভূমির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

^{৮৯} বুখারী(১৯৩৬) ও মুসলিম(১১১১)।

অতএব রোযাদার যদি রাম্বাদানে স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় তবে তার কাফফারা হল:

- ❖ দাস^{১০} মুক্ত করা,
- ❖ তা সম্ভব না হলে টানা ২মাস সাওম পালন করা,
- ❖ তা সম্ভব না হলে^{১১} ৬০ জন মিসকীন খাওয়ানো।^{১২}
- ❖ যদি মিসকীন খাওয়ানোর সামর্থ্য না থাকে, তবে কিছুই করতে হবে না এবং পরবর্তীতে সামর্থ্য হলেও তা আদায় করতে হবে না। কেননা আল্লাহ পাক বলেন:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَنَهَا

“আল্লাহ কাউকে যা দিচ্ছেন তার চেয়ে বেশী বোঝা চাপান না।”^{১৩}

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর...”^{১৪}

এছাড়া শরীয়তের একটি মূলনীতি হল: কোন বিষয় অক্ষমতার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক থাকে না।

আর হাদীসে বর্ণিত ব্যক্তি ৬০ জন মিসকীন খাওয়ানোর অপারগতা প্রকাশের পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে আর কোন নির্দেশ দেননি। আর হাদীসের শেষে যে সাদাকার বিবরণ

^{১০} এই দাসকে মুমিন হতে হবে, কেননা আল কুরআনের অন্যত্র যে দাসকে মুক্ত করতে হবে, তাকে মুমিন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এছাড়া মুয়াবিয়া ইবনে আল-হাকাম(রা.) রাগায়িত হয়ে এক দাসীকে আঘাত করার পর তাকে মুক্ত করে দিতে চাইলে আল্লাহর রাসুলের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে প্রশ্ন করে যাচাই করে নেন যে সে মুমিন কিনা। দেখুন: মুসলিম(৫৩৭)।

^{১১} যে রাম্বাদানের সাওম পালনে সক্ষম, তাকে টানা ২মাস সাওম পালনে সক্ষম ধরা হবে। তবে কেউ নিজেকে অক্ষম বলে দাবী করলে মুফতী তার দাবী মেনে নেবেন এবং তাকে ৬০ জন মিসকীন খাওয়াতে বলবেন।

^{১২} এর সপক্ষে দলীল হল সহীহ আল-বুখারী(১৯৩৬) মুসলিমে(১১১১) বর্ণিত দীর্ঘ হাদীস।

^{১৩} সূরা আত তালাক, ৬৫ : ৭।

^{১৪} সূরা আত তাগাবুন, ৬৪ : ১৬।

এসেছে, তা স্পষ্টতই কাফফারা নয়, কেননা ঐ ব্যক্তির পরিবারের সদস্য নিশ্চয়ই ৬০ নয়!

মাসআলা ৩.৩.১ : কাফফারার সাথে কাযাও আদায় করতে হবে কেননা ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে কাফফারা দেয়ার পাশাপাশি কাযা আদায়েরও নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন:

“তার পরিবর্তে একদিন সাওম পালন কর।”^{১৫}

মাসআলা ৩.৩.২ : যদি এই কাজে স্বীর সম্মতি থাকে, তবে উভয়ের ওপর কাফফারা ও কাযা বাধ্যতামূলক হবে, কেননা এক্ষেত্রে মূলনীতি হল: সাধারণভাবে শরীয়তের সকল বিধানে পুরুষ ও নারী উভয়েই शामिल, যদিও বা সেই বিধানের বর্ণনা কেবল পুরুষের ক্ষেত্রে এসে থাকে। তবে কোন বিধান কেবল পুরুষ বা কেবল নারীর জন্য প্রযোজ্য বলে প্রমাণিত হলে ভিন্ন কথা। যদি এই কাজ স্বীর পক্ষ থেকে বাধা সত্ত্বেও জোরপূর্বক করা হয়, তবে স্বীর রোযা ভঙ্গ হবে না, স্বীকে কাযা বা কাফফারা কোনটাই আদায় করতে হবে না। কেননা কোন বিষয় সাওম ভঙ্গকারী তখনই হবে যখন তা স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে করা হবে। এই শর্তগুলোর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

মাসআলা ৩.৩.৩ : মিসকীন খাওয়ানোর সংজ্ঞা ইতিপূর্বে বর্ণিত ফিদয়ার মতই, তবে পার্থক্য হল, এক্ষেত্রে ৬০ জন স্বতন্ত্র মিসকীনকে খাওয়াতে হবে, ১ জন ব্যক্তিকে একাধিক জনের ফিদয়া দেয়া যাবে না, কেননা এক্ষেত্রে হাদীসে “৬০” সংখ্যাটির উল্লেখ এসেছে।

মাসআলা ৩.৩.৪ : সাওম একটানা দুমাস পালন করতে হবে, মাঝখানে ছেদ পড়লে নতুন করে শুরু করতে হবে। তবে যে সমস্ত

^{১৫} ইবনে মাজাহ(১৬৭১)। আলবানীর মতে সহীহ।

ওজরে বা কারণে রামাদানের সাওম ভঙ্গ করা বৈধ হয়, সে সমস্ত কারণে একটানা দুম্বাস সাওমের মাঝে ছেদ পড়লে অসুবিধা নেই। এধরনের ওজরের বিবরণ ইতিপূর্বেই গত হয়েছে।^{১৬} তেমনি টানা দুম্বাসের মাঝে ঈদের দিন কিংবা আইয়ামে তাশরীক পড়ে গেলে সেই দিন গুলো বাদ দিতে হবে এবং দুম্বাস হওয়ার ঠিক পরপরই সেই কয়দিনের সাওম পালন করতে হবে। কেননা ঐ দিনগুলোতে সাওম পালন নিষিদ্ধ, যার বিবরণ সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

মাসআলা ৩.৩.৫: একটানা দুম্বাস গণনা করতে হবে চাক্ষু মাসের হিসেবে। উদাহরণ স্বরূপ কেউ যদি শাওয়ালের ৫ তারিখে সাওম শুরু করে, তবে তাকে বাকী শাওয়াল, সম্পূর্ণ যুল কা'দা এবং যুল হিজ্জাহ মাসের ৪ তারিখ পর্যন্ত সাওম পালন করতে হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে ২ মাসে ৫৮ দিনও হতে পারে।

৩.৪ বীর্যপাত

কারণ যদি নিজস্ব ক্রিয়া কিংবা স্ত্রীকে স্পর্শ বা চুম্বন করার মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটে, তবে তার সাওম ভঙ্গ হবে। কেননা আল্লাহ পাক বলেন:

“সে আমার জন্য খাদ্য, পানীয় ও কামনা পরিত্যাগ করে, সিয়াম আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব।”^{১৭}

এখানে ‘শাহওয়া’ () বা কামনার মাঝে বীর্যপাত অন্তর্ভুক্ত, কেননা অপর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

^{১৬} তবে কেবল সাওম ভঙ্গ করার জন্যই যদি সফর করে, তবে তা ওজর হিসেবে গণ্য হবে না।

^{১৭} বুখারী(১৮৯৪), মুসলিম(১১৫১)।

.«

...

»

«

“...তোমাদের কারও স্বী-সহবাসে সাদাকা রয়েছে” তাঁরা বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কেউ যখন তার কামনা পূর্ণ করে, তখন তার সওয়াব হয়?” তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: “তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে যদি সে তা নিষিদ্ধ স্থানে রাখত, তবে কি তার গুনাহ হত না? তেমনি যদি সে তা হালাল স্থানে রাখে, তবে তার সওয়াব হবে।”^{১৮}

এই হাদীসে ‘শাহওয়া’() বা কামনাকে ‘রাখার’ কথা বলা হয়েছে, আর যা রাখা হয়, তা হল বীর্য, ফলে তা ‘শাহওয়া’ শব্দের অন্তর্গত।

মাসআলা ৩.৪.১: শুধুমাত্র চিত্তার কারণে বীর্যপাত হলে সাওম ভঙ্গ হবে না, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমার উম্মাতের লোকদের অন্তরসমূহের ওয়াসওয়াসাকে ক্ষমা করেছেন যতক্ষণ না তারা আমল করে কিংবা ব্যক্ত করে।”^{১৯}

মাসআলা ৩.৪.২: দৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে, অর্থাৎ চিত্তার মতই শুধুমাত্র দৃষ্টিপাতের দ্বারা বীর্যপাত ঘটলে সাওম

^{১৮} মুসলিম(১০০৬)।

^{১৯} বুখারী(৫২৬৯), মুসলিম(১২৭)।

ভঙ্গ হবে না। স্বপ্নদোষের কারণে বীর্যপাত হলেও সাওম ভঙ্গ হবে না, কেননা তা অনিচ্ছাকৃত।

মাসআলা ৩.৪.৩ : মযী^{১০০} নির্গত হলে সাওম ভঙ্গ হবে না, কেননা মযীর দ্বারা সাওম ভঙ্গ হওয়ার সপক্ষে দলীল নেই, আর তা বীর্যের সাথে তুলনীয় নয়।

৩.৪.৪ সাওম অবস্থায় চুম্বন, স্পর্শ ইত্যাদির বিধান

কোন ব্যক্তি বীর্যপাত না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে তার জন্য সাওম অবস্থায় স্ত্রী/স্বামীকে চুম্বন, স্পর্শ ইত্যাদি জায়েয, নতুবা তা জায়েয নয়। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

“নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোযাদার থাকা অবস্থায় চুম্বন ও স্পর্শ করতেন, আর তিনি তোমাদের মধ্যে নিজের কামনাকে সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণকারী।”^{১০১}

তবে বীর্যপাত হয়ে গেলে সাওম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে কাযা করে নিতে হবে।

৩.৫ রক্তপাত বা রক্ত-নির্গমন

নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে দেহের কোন অংশ কেটে বা চিরে সেখান থেকে রক্ত বের করে নেয়ার মাধ্যমে চিকিৎসার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল যাকে আরবীতে “হিজামাহ”() বলা হয়।

^{১০০} উক্তের কারণে যে পাতলা, আঠালো তরল নির্গত হয়।

^{১০১} বুখারী(১৯২৭), মুসলিম(১১০৬)।

যিনি রক্ত বের করেন, তাকে বলা হয় ‘হাজ্জিম’(), আর যার দেহ থেকে রক্ত নির্গত করা হয়, তাকে বলা হয় ‘মাহজুম’()। সে যুগে রক্ত নির্গমনের স্থানে শোষণকারী কোন বস্তু লাগিয়ে সাধারণত মুখ দিয়ে টেনে রক্ত বের করা হত। সাওম অবস্থায় “হিজামা” সম্পর্কে নিম্নলিখিত হাদীসগুলো পাওয়া যায়:

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে “নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহরাম অবস্থায় রক্ত-নির্গমন করিয়েছেন এবং রোযাদার অবস্থায় রক্ত নির্গমন করিয়েছেন।”^{১০২}

আনাস বিন মালিককে (রা.) প্রশ্ন করা হয়েছিল: “আপনারা কি সাওম পালনকারীর রক্ত নির্গমনকে অপছন্দ করতেন?” তিনি বলেন: “না তবে সে দুর্বল হয়ে পড়বে এজন্য।”^{১০৩}

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: “‘হাজ্জিম’ এবং ‘মাহজুম’ উভয়েরই ইফতার হয়েছে [হবে]”^{১০৪}

^{১০২} বুখারী(১৯৩৮)।

^{১০৩} বুখারী(১৯৪০)।

^{১০৪} আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাছাহ। আলবানীর মতে সহীহ।

রক্ত-নির্গমন সংক্রান্ত এই বিবিধ হাদীস থাকার কারণে এবং এপ্রলোর সহীহ বা দুর্বল হওয়া নিয়ে মতভেদের কারণে এই বিধান সম্পর্কে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে:

জমহর তথা অধিকাংশের মতে ‘হিজামাহ’ এর কারণে সাওম ভঙ্গ হয় না। আর ইমাম আহমদের (র.) মতে ‘হিজামাহ’ এর কারণে সাওম ভঙ্গ হয়।

উপরোক্ত সবগুলো হাদীসকে সহীহ ধরে নিয়ে এদের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব। আনাসের (রা.) বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে সাওম অবস্থায় ‘হিজামাহ’ অপছন্দ করার কারণ এই যে এতে করে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। আর তাই “‘হাজিম’ এবং ‘মাহজুম’ উভয়েরই ইফতার হয়েছে [হবে]” বলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বোঝাতে চেয়েছেন যে শীঘ্রই তাদের সাওম ভেঙ্গে যাবে: ‘মাহজুম’ এর ক্ষেত্রে রক্ত নির্গমনে সৃষ্ট দুর্বলতার কারণে, আর ‘হাজিম’ এর ক্ষেত্রে রক্ত-শোষণের সময় গলায় কিছু চলে যাওয়ার কারণে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আরও বর্ণিত যে:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীগণের প্রতি যত্নের কারণে ‘হিজামাহ’ এবং একটানা [ইফতার না করে] সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন কিন্তু তা হারাম করেননি।^{১০৫}

সিদ্ধান্ত: তাই বলা যায় যে শুধুমাত্র রক্ত-নির্গমনের দ্বারা সাওম ভঙ্গ হবে না, তা অল্প হোক বা অধিক হোক।

মাসআলা ৩.৫.১: একই বিধান প্রযোজ্য হবে বর্তমান যুগে রক্ত-পরীক্ষা বা রক্তদানের ক্ষেত্রে।

^{১০৫} আহমদ, আবু দাউদ ও অন্যান্য। আলবানী ও আরনাউতের মতে সহীহ।

মাসআলা ৩.৫.২ : রোযাদার রক্ত দান করতে পারবে কি?

যদি রক্তদানের ফলে তার দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা থাকে, তবে সে ইঁফতারের পরে রক্তদান করবে। আর যদি রোগীকে তৎক্ষণাৎ রক্তদান করা জরুরী হয়, তবে সে রক্তদান করবে এবং শরীরে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য পানাহারের প্রয়োজন হলে সাওম ভঙ্গ করবে আর পরবর্তীতে এই সাওমের কাযা আদায় করে নেবে।

৩.৬ সাওম ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর দ্বারা সাওম ভঙ্গের শর্ত

সাওম ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর দ্বারা সাওম ভঙ্গ হওয়ার ৩টি শর্ত রয়েছে :

১. ইচ্ছাকৃতভাবে তা করা।

২. সচেতনভাবে অর্থাৎ স্মরণ থাকা অবস্থায় তা করা।

৩. এ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা।

অর্থাৎ সংক্ষেপে এই তিনটি শর্ত হল সংকল্প, সচেতনতা ও জ্ঞান।

এই শর্তগুলোর সপক্ষে দলীল হল :

আল্লাহর বাণী :

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ، وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ

“আর এ বিষয়ে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন পাপ নেই ;
কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে (পাপ হবে)।”^{১০৬}

^{১০৬} সূরা আল আহযাব, ৩৩ : ৫।

আল্লাহ পাক আরও বলেন:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

“যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরীর দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের ওপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব। ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরী করতে) অথচ তার অন্তর ঈমানের ওপর অটল।”^{১০৭}

এই আয়াতটিতে জ্বরদস্তির ক্ষেত্রে কুফরী কথা বা কাজকে পর্যন্ত ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, আর কুফরের চেয়ে ছোট কিছুর ক্ষেত্রে তো তা অধিকতর প্রযোজ্য।

আল্লাহ পাক আরও বলেন:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

“হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।”^{১০৮}

এর জবাবে আল্লাহ পাক বলেন: “আমি করলাম।”^{১০৯}

^{১০৭} সূরা আন নাহল, ১৬ : ১০৬।

^{১০৮} সূরা আন বাকারা, ২ : ২৮৬।

^{১০৯} মুসলিম(১২৬)। অর্থাৎ এই প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে।

হাদীসে বর্ণিত, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

“নিশ্চয়ই আল্লাহর আমার উম্মাতের অনিচ্ছাকৃত ক্রটি, ভুল ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদেরকে দিয়ে যা করানো হয়েছে - তা ক্ষমা করেছেন।”^{১১০}

এছাড়া সাওম প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

“রোযাদার অবস্থায় যে ভুলে গেল, ফলে পানাহার করল, সে যেন তার সাওম পূর্ণ করে, কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।”^{১১১}

অতএব এই তিনটি শর্তের কোন একটি অপূর্ণ থাকলে সাওম ভঙ্গ হবে না। যেমন অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু ঘটলে, কিংবা কেউ বাধ্য করলে, কিংবা ভুলে গেলে অথবা জানা না থাকলে। আবার জানা না থাকা দুপ্রকার হতে পারে: ১) শরীয়তের বিধান জানা না থাকা, ২) অবস্থা সম্পর্কে না জানা, যেমন: প্রকৃতপক্ষে সূর্যাস্ত হয়নি - একথা না জানা।

কতিপয় উদাহরণ:

ক. কোন ব্যক্তি যদি জোরপূর্বক রোযাদার স্বীর সাথে মিলিত হয় এবং স্বী বাধা প্রদান করেও ব্যর্থ হয়, তবে স্বীর সাওম ভঙ্গ হবে না। তেমনি কোন ব্যক্তিকে ভয় দেখিয়ে সাওম ভঙ্গকারী কোন কাজ করতে বাধ্য করলেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

^{১১০} ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য। হাদীসটি দুর্বল, তবে আল-কুরআন ও সুন্নাতে এর বক্তব্যের সমর্থন রয়েছে।

^{১১১} বুখারী(১৯৩৩), মুসলিম(১১৫৫)।

খ. উড়ে এসে কারও মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু পেটে চলে গেলে সাওম ভঙ্গ হবে না।

গ. আল্লাহ পাক বলেন:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা সুতা কাল সুতা থেকে স্পষ্ট হয়।”^{১১৬}

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে একজন সাহাবী তাঁর বালিশের নীচে এক টুকরো কালো ও এক টুকরো সাদা – দুই টুকরো সুতা রাখলেন এবং সঠিকভাবে উম্মার গু নির্ধারণ করতে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন যে তিনি এই দুই টুকরো সুতার পার্থক্য করতে পারছেন কিনা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরে তা জানতে পেয়ে ব্যাখ্যা করলেন যে এই আয়াতে উম্মার দিগন্তের শুভ্র আভা থেকে রাত্রির অন্ধকারের কক্ষতার পার্থক্য করার কথা বলা হচ্ছে।^{১১৭}

এই সাহাবী শরীয়তের বিধান বুঝতে ভুল করেছিলেন ফলে তিনি এ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন, আর তাই তিনি প্রকৃতপক্ষে ফজর হওয়ার পরেও অজ্ঞতাবশত পানাহার করেছেন অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে সাওম কাযা করার নির্দেশ দেননি।

^{১১৬} সূরা আল বাক্বারা, ২ : ১৮৭।

^{১১৭} হাদীসটি বুখারী(১৯১৬), মুসলিম(১০৯১) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

ঘ. হাদীসে বর্ণিত :

আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন: “নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে এক মেষের দিনে আমরা ইফতার করলাম, অতঃপর সূর্য উদ্দিত হল।”^{১১৪}

এক্ষেত্রেও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাওমের কাযা আদায় করতে বলেছেন বলে জানা যায় না, যদি তিনি কাযা আদায়ের নির্দেশ দিতেন, তবে নিশ্চয়ই তা হাদীসের মাধ্যমে সংরক্ষিত হত, কিন্তু এক্ষেত্রে হাদীসে এরকম কোন বিবরণ না পাওয়াই প্রমাণ করে যে তিনি কাযা আদায়ের নির্দেশ দেননি। এটি অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার উদাহরণ।

ঙ. কুলি করা বা নাকে পানি দেয়ার ফলে তা অনিচ্ছাকৃতভাবে গলায় চলে গেলে সাওম ভঙ্গ হবে না।

চ. স্বপ্নদোষের ফলে সাওম ভঙ্গ হবে না, কেননা তা ইচ্ছাকৃত নয়।

মাসআলা ৩.৬.১: ভুল, অজ্ঞতাবশত বা জ্বরদস্তির কারণে সাওম ভঙ্গকারী কোন বিষয় সংঘটিত হলেও স্মরণ হওয়া মাত্র, কিংবা জানামাত্র ও জ্বরদস্তির অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়া মাত্র ঐ বিষয় থেকে বিরত থাকা জরুরী। যেমন: কেউ ভুলে খাওয়া শুরু করল, মনে পড়া মাত্র মুখে অবস্থিত খাদ্য বাইরে নিক্ষেপ করতে হবে।

^{১১৪} বুখারী(১৯৫৯)।

অধ্যায় ৪ : নফল সিয়াম

৪.১ নবী দাউদের (আ.) সিয়াম

নফল সিয়ামের মাঝে সর্বোত্তম হল নবী দাউদের(আ.) সিয়াম :

:

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রা.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, যে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: “আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় সালাত হল দাউদের (আ.) সালাত এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় সিয়াম হল দাউদের (আ.) সিয়াম, তিনি অর্ধেক রাত্রি ঘুমাতে, এক তৃতীয়াংশ তাহাজ্জুদ আদায় করতেন আবার এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাতে। এবং তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন আর একদিন ইফতার করতেন [অর্থাৎ প্রতি দুদিনে একদিন নফল সাওম পালন করতেন]।”^{১১৫}

অপর বর্ণনায় এসেছে যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আসকে (রা.) বললেন:

^{১১৫} বুখারী(১১৩১), মুসলিম(১১৫৯)।

“প্রতি মাসে তিনদিন সাওম পালন কর কেননা সওয়াব দশগুণ হিসেবে, আর তা আজীবন সাওম পালনের মত।” আমি বললাম: আমি এর চেয়েও বেশী করতে সক্ষম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: “তবে একদিন সাওম পালন কর আর দুদিন বিরত থাক।” আমি বললাম: আমি এর চেয়ে বেশী করতে সক্ষম। তিনি বললেন: “তবে একদিন সাওম পালন কর আর একদিন বিরত থাক, কেননা তা দাউদের (আ.) সিয়াম, আর তা [নফল] সিয়ামের মধ্যে সর্বোত্তম।” আমি বললাম: আমি এর চেয়েও বেশী করতে সক্ষম, অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: “এর চেয়ে আর উত্তম নেই।”^{১১৬}

মাসআলা ৪.১.১: এঁই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে সারা বছর রোযাদার থাকা অনুমোদিত নয়। অন্য রিওয়ায়েতে এসেছে:

“যে আজীবন রোযা রাখল সে রোযা রাখে নি।”^{১১৭} কোন রিওয়ায়েতে এসেছে:

“সে রোযাও রাখেনি এবং ইফতারও করে নি।”^{১১৮}

^{১১৬} বুখারী(১৯৭৬), মুসলিম(১১৫৯)।

^{১১৭} বুখারী(১৯৭৭), মুসলিম(১১৬২)।

অর্থাৎ তার জন্য সাওমের সওয়াব নেই। অথবা এর অর্থ হতে পারে যে সে বাস্তবে সাওম পালন করেনি, কেননা সে প্রতিদিন সাওম পালনের কারণে এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভব করবে না। অথবা হাদীসটির অর্থ হতে পারে:

“যে আজীবন রোযা রাখল তার যেন রোযা না হয়”

এক্সেপ্তে হাদীসটি আজীবন সাওম পালনকারীর বিরুদ্ধে দুআ। যে অর্থেই হোক না কেন আজীবন সাওম পালন প্রশংসনীয় নয়, নিন্দনীয় কাজ।

৪.২ মুহাররাম মাসের সাওম

মাস হিসেবে রামাদানের পর সর্বোত্তম হল মুহাররাম মাসের সিয়াম, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হল রাত্রির সালাত, আর রামাদানের পর সর্বোত্তম সিয়াম হল আল্লাহ পাকের মুহাররাম মাসের সিয়াম।”^{১১১}

^{১১১} মুসলিম(১১৬২)।

^{১১২} মুসলিম(১১৬৩)।

৪.৩ যুলহিজ্জার প্রথম দশক

যুলহিজ্জার প্রথম ১০ দিনের [ঈদের দিন বাদে] সাওমের ফযীলত রয়েছে, কেননা বছরের সকল দিবসের মাঝে এই ১০ দিনের আমল আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে প্রিয়:

ইবনে আব্বাস (রা.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন: “এই দিনগুলোর আমলের চেয়ে অন্য কোন দিনের আমল অধিকতর উত্তম নয়।” তাঁরা [সাহাবীগণ] বললেন: জিহাদও নয়? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: “জিহাদও নয়, তবে সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তার জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি নিয়ে বের হয় আর কিছু নিয়ে ফিরে আসে না।”^{১২০}

৪.৪ শাওয়ালের ৩টি সাওম

রামাদানের পর শাওয়ালে ছয়টি সাওম পালন করলে সারা বছর সাওম পালনের সওয়াব রয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“যে রামাদানের সাওম পালন করে শাওয়ালের ছয়টি দিয়ে তার অনুসরণ করল, তা সারা বছর সাওমের মত হল।”^{১২১}

^{১২০} বুখারী(৯৬৯)।

^{১২১} মুসলিম(১১৬৪)।

৪.৫ আরাফার দিনের সাওম

আরাফার দিন তথা যুলহিজ্জা মাসের ৯ তারিখ সাওম পালন করলে তা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বছরের [সগীরা] গুনাহের কাফফারা হয়, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দিনের সাওম সম্পর্কে বলেন:

“তা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বছরের গুনাহ মিটিয়ে দেয়।”^{১২২}

তবে আরাফার ময়দানে অবস্থানকারী হাজীর জন্য এদিনের সাওম মুস্তাহাব নয়, কেননা তাঁর উঁচিৎ এইদিনে দুআর জন্য শক্তি সঞ্চয় করা, আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দিনে সাওম পালন করেননি।^{১২৩}

৪.৬ আশুরার সাওম

আশুরা অর্থাৎ মুহাররামের ১০ তারিখের সাওম পূর্ববর্তী বছরের গুনাহের কাফফারা হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দিনের সাওম সম্পর্কে বলেন:

“তা পূর্ববর্তী বছরের গুনাহ মিটিয়ে দেয়।”^{১২৪}

আশুরার সাওম একদিন রাখা জায়েয, তবে এর সাথে এর পূর্বের একদিন কিংবা পরের একদিন যোগ করলে তা উত্তম, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সম্পর্কে বলেন:

^{১২২} মুসলিম(১১৬২)।

^{১২৩} বুখারী(১৯৮৮), মুসলিম(১১২৩)।

^{১২৪} মুসলিম(১১৬২)।

“...সুতরাং আল্লাহ চাইলে আপামী বছর আমরা নয় তারিখে সিয়াম পালন করব...”^{১২৫}

এর তাৎপর্য হল ইহুদী-নাসারাদের আমলের সাথে ভিন্নতা বজায় রাখা, কেননা তারা কেবল দশ তারিখে সাওম পালন করত।

৪.৭ সোম ও বৃহস্পতিবারের সাওম

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সাওমের বিশেষ ফযীলত রয়েছে। হাদীসে বর্ণিত:

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সোম ও বৃহস্পতিবারের সাওম পালনে সচেষ্টিত থাকতেন।^{১২৬}

এবং এ সম্পর্কে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারে আমলসমূহ প্রদর্শিত হয়, অতঃপর আল্লাহ সকল মুসলিম বা সকল মুমিনকে ক্ষমা করেন কেবল পরস্পর সম্পর্কে হিন্দকারী দুজন ছাড়া, [আল্লাহ পাক] বলেন: “তাদের দুজনের ব্যাপারে বিলম্ব কর।”^{১২৭}

^{১২৫} মুসলিম(১১৬৪)।

^{১২৬} আহমদ, ইবনে মাজাহ। আরনাউত ও আলবানীর মতে সহীহ।

^{১২৭} আহমদ ও অন্যান্য। আরনাউত ও আলবানীর মতে সহীহ।

৪.৮ সোমবারের সাওম

সোমবারের সাওম সম্পর্কে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“ওটা এমন দিন যেদিন আমার জন্ম হয়েছে, এবং যেদিন আমাকে পাঠানো বা আমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে।”^{১২৮}

৪.৯ প্রতি মাসে তিনদিন সাওম পালন

প্রতি মাসে তিনদিন সাওম পালন করা মুস্তাহাব আর ঐ তিনদিন যদি “আইয়ামে বিদ”^{১২৯} হয় তবে তা আরও উত্তম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

!

“হে আবু যার! যদি তুমি মাসের তিনদিন সাওম পালন কর তবে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ সাওম পালন কর।”^{১৩০}

মাসআলা ৪.১০: নফল সাওম ভঙ্গ করা বৈধ। তবে বিনা কারণে তা করাটা অপছন্দনীয়।^{১৩১} এর দলীল নিম্নোক্ত হাদীস:

^{১২৮} মুসলিম(১১৬২)।

^{১২৯} চাক্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখকে “আইয়ামে বিদ” বলা হয়, কেননা এ সময় রাত্রিগুলো চাঁদের আলোয় আলোকিত থাকে।

^{১৩০} আহমদ, তিরমিযী। আলবানীর মতে হাসান সহীহ।

^{১৩১} নফল ইবাদত মাঝপথে ভঙ্গ করলে আংশিক সওয়াব পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

« » . « »
» .
.«

উম্মুল মুমিনীন আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন আমার নিকট এসে বললেন: “তোমাদের কাছে [খাবার] কিছু আছে কি?” আমরা বললাম: “না।” তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: “সেফেত্রে আমি রোযা থাকলাম।” এরপর আরেকদিন তিনি আসলে আমরা বললাম: “আমাদেরকে ‘হাইস’^{১৩২} উপহার দেয়া হয়েছে।” তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: “সেটা নিয়ে এসো^{১৩৩}, আমি সকাল থেকে রোযা আছি।” এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খেলেন।^{১৩৪}

৪.১১ যে সকল দিবসে সাওম পালন নিষিদ্ধ

৪.১১.১ দুই ঈদ

দুই ঈদের দিন সাওম নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল হল:

^{১৩২} খেজুর, পনীর, যি দিয়ে তৈরী একধরনের খাদ্যদ্রব্য।

^{১৩৩} শাব্দিক অনুবাদ: সেটা আমাকে দেখাও।

^{১৩৪} মুসলিম(১১৫৪)।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে “আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই দিনের সিয়াম নিষেধ করেছেন: আদহার দিন এবং ফিতরের দিন।”^{১৩৫}

৪.১১.২ আইয়ামে তাশরীক

অর্থাৎ যুলহিজ্জার ১১, ১২, ১৩ তারিখ। এর দলীল হল আমর ইবনুল আসের (রা.) বক্তব্য:

“খাণ্ড। এই দিনগুলোই সেসব দিন যার ইফতারের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেবকে নির্দেশ দিতেন এবং এর সিয়াম পালনকে নিষেধ করতেন।” মালিক বলেন: “সেটা আইয়ামে তাশরীক।”^{১৩৬}

তবে এর ব্যতিক্রম হলেন তাম্বু হুজ্জ পালনকারী, তিনি যদি হুজ্জের পশু কুরবানী করার সামর্থ্যের অধিকারী না হন তবে তাকে যে সিয়াম পালন করতে হয় তা এই দিনগুলোতে শুরু করা বৈধ। এ প্রসঙ্গে আয়শা (রা.) এবং ইবনে উম্মার (রা.) থেকে বর্ণিত:

“আইয়াম তাশরীকে সাওম পালনের ব্যাপারে কেবল তাকেই সহজতা দেয়া হয়েছে যার [হুজ্জের] পশু কুরবানী দেয়ার সামর্থ নেই।”^{১৩৭}

^{১৩৫} বুখারী(১১৯৭), মুসলিম(১১৩৮)।

^{১৩৬} মালিক, আবু দাউদ। আলবানীর মতে সহীহ।

^{১৩৭} বুখারী(১৯৯৭)।

৪.১১.৩ জুম্ময়ার দিনকে এককভাবে সাওমের জন্য বাছাই করা

জুম্ময়ার দিনকে এককভাবে সাওমের জন্য বাছাই করা মাকরুহ, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই জুম্ময়ার দিনের সাথে তার পূর্বের বা পরের দিন যুক্ত করা ছাড়া সাওম পালন না করে।”^{১৩৮} মুসলিমের এক ভাষ্যে বর্ণিত:

“তোমরা সকল রাত্রির মাঝে জুম্ময়ার রাত্রিকে কিয়ামের জন্য বেছে নিও না, এবং সকল দিবসের মাঝে জুম্ময়ার দিবসকে কিয়ামের জন্য বেছে নিও না, তবে তোমাদের কেউ অভ্যাসবশত যে সাওম পালন করে, তা যদি সেই সাওমের দিন হয় তবে তা ব্যতিক্রম।”^{১৩৯}

হাদীসে আরও এসেছে:

জুম্ময়ার দিনে আল-হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি (রা.) সাওম পালনরত অবস্থায় নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুম্ময়ার দিন তাঁর নিকট আসলেন এবং বললেন: “গতকাল সাওম

^{১৩৮} বুখারী(১৯৮৫), মুসলিম(১১৪৪)।

^{১৩৯} মুসলিম(১১৪৪)।

পালন করেছিলে?” তিনি বললেন: “না।” তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: “আগামীকাল সাওম পালন করার ইবাদা আছে?” তিনি বললেন: “না।” তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: “তবে ইফতার করে ফেল।”^{১৪০}

এ সমস্ত হাদীস থেকে বোঝা যায় যে জুম্মার দিনকে এককভাবে সাওমের জন্য বাছাই করা মাকরুহ, তবে এর পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী দিনের সাথে তাকে সাওমের দ্বারা যুক্ত করে নিলে অসুবিধা নেই।

৪.১১.৪ শনিবারকে সাওমের জন্য এককভাবে বাছাই করা

এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত:

) :

আব্দুল্লাহ বিন বুসর তাঁর ভগ্নী থেকে বর্ণনা করেন যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: “তোমাদের জন্য যা ফরয করা হয়েছে, তা ছাড়া তোমরা শনিবারে সাওম পালন করো না, আর তোমাদের কেউ যদি আঙ্গুরের ছাল কিংবা গাছের ডাল ছাড়া আর কিছু না পায়, তবে অন্তত: তা-ই যেন সে চর্বন করে।”^{১৪১}

এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে শনিবারকে এককভাবে সাওমের জন্য বাছাই করা মাকরুহ।

^{১৪০} বুখারী(১৯৮৬)।

^{১৪১} আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। আনবানীর মতে সহীহ।

মাসআলা ৪.১১.৪.১: নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে এককভাবেও জুম্মার দিন কিংবা শনিবারে সাওম পালন করা মাকরুহ নয়:

- ❖ ফরয সাওম কিংবা তার কাযা আদায়ের ক্ষেত্রে।
- ❖ কারও অভ্যাসের সাথে মিলে গেলে, যেমন ধরা যাক সে একদিন পরপর সাওম পালন করে।
- ❖ আশূরা কিংবা আরাফার দিনের সাথে মিলে গেলে।

৪.১২ শাবানের নফল সাওম

শাবান হল রামাদানের পূর্বের মাস। শাবানের নফল সাওম সম্পর্কে কয়েক ধরনের বর্ণনা আসায় এগুলোর মাঝে সুন্দর সমন্বয় প্রয়োজন, আর তাই একে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে রাখা হল।

প্রথমত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পূর্ণ শাবান অথবা এর অধিকাংশই সাওম পালন করতেন, এ সংক্রান্ত দলীল পাওয়া যায় নিম্নোক্ত হাদীস সমূহে:

উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: “আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনও পরপর দুমাস সাওম পালন করতে দেখিনি, শুধু ব্যতিক্রম হল এই যে তিনি শাবানকে [সাওমের দ্বারা] রামাদানের সাথে যুক্ত করতেন।”^{১৪২}

....:

^{১৪২} আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ। আলবানী ও আরনাউতের মতে সহীহ।

আয়শা(রা.) বলেন: “...আর আমি তাঁকে শাবানের চেয়ে বেশী [নফল] সিয়াম পালন করতে আর কোন মাসেই দেখিনি, তিনি পুরো শাবানই রোযা থাকতেন, তিনি প্রায় পুরো শাবানই রোযা রাখতেন।”^{১৪৩}

এই উভয় প্রকার বর্ণনার সময়স্বয়ের ক্ষেত্রে দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে:

১. নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন কোন বছর পুরো শাবান, কোন কোন বছর শাবানের অধিকাংশ সাওম পালন করতেন।
২. নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রায় পুরো শাবানই রোযা থাকতেন, কেননা এক্ষেত্রে আরবী ভাষারীতি অনুযায়ী “তিনি পুরো শাবান রোযা রেখেছেন” - এ কথা বলা সিদ্ধ।

তাই বলা যায় যে শাবানের অধিকাংশ বা পুরোটাই সাওম পালন করা মুস্তাহাব।

অন্য হাদীসে এসেছে:

- - -
» -
«

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “তোমরা এক বা দুদিনের সাওমের দ্বারা রামাদানের অগ্রবর্তী হয়ো না, তবে ব্যতিক্রম হল এমন ব্যক্তি যে অভ্যাসবশত: সাওম পালন করে থাকে, সে সেই সাওম পালন করুক।”^{১৪৪} অপর একটি হাদীসে এসেছে:

^{১৪৩} মুসলিম(১১৫৬)।

^{১৪৪} বুখারী(১৯১৪), মুসলিম(১০৮২)।

» - -

«

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: “শাবানের অর্ধেক অতিবাহিত হলে তোমরা সাওম পালন করো না।”^{১৪৫}

সর্বশেষ এই দুটো হাদীসকে এদের পূর্ববর্তী হাদীসগুলোর আলোকে বিবেচনা করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তা হল:

১. যে শাবানের প্রথম ভাগে সাওম পালন করেনি, তার জন্য শুধুমাত্র এর দ্বিতীয় অর্ধাংশকে সাওমের জন্য বাছাই করা মাকরুহ।

২. গোটা শাবান বা অধিকাংশ শাবানে সাওম পালন না করলে শাবানের শেষ এক বা দুইদিন সাওম পালন করা নিষিদ্ধ বা হারাম। এর মধ্যে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হল ৩০শে শাবানের সাওম, যাকে বলা হয় ইয়াম্মুশ শাক্ব () বা সংশয়ের দিন, কেননা চাঁদ না দেখার কারণেই এই দিনটিকে গণনা করা হয়েছে, আর সম্ভাবনা আছে যে চাঁদ উঠেছিল কিন্তু তা দেখা যায় নি। এই দিনটির সাওম বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ নিম্নোক্ত হাদীসটি যাতে আন্নার বিন ইয়্যাসির (রা.) বলেন:

“যে এই দিনটিতে রোযা থাকল সে আবুল কাসিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অমান্য করল।”^{১৪৬}

^{১৪৫} আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। আলবানীর মতে সহীহ।

^{১৪৬} আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। আলবানীর মতে সহীহ।

এই দিনগুলোর সাওম পালনের ব্যাপারে নিম্নেদাফা থেকে যাদের অব্যাহতি রয়েছে:

❖ যারা প্রায় গোটা শাবানই সাওম পালন করেছে।

❖ যারা তাদের নফল সাওম পালনের অভ্যাস অনুযায়ী ঐ দিনগুলোতে সাওম পালন করবে। যেমন কারণ যদি প্রতি সোমবারে সাওম পালনের অভ্যাস থাকে এবং শাবানের ৩০ তারিখ সোমবার হয় তবে অসুবিধা নেই। তেমনি কেউ যদি একদিন পরপর সাওম পালনে অভ্যস্ত হয় এবং তদানুযায়ী ৩০ তারিখে রোযা রাখে, সেক্ষেত্রেও সমস্যা নেই - ইত্যাদি। এর দলীল হলো ইতিপূর্বে উল্লেখিত নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বক্তব্য: "...তবে ব্যতিক্রম হল এমন ব্যক্তি যে অভ্যাসবশত: সাওম পালন করে থাকে, সে সেই সাওম পালন করুক।"

অধ্যায় ৫ : রামাদানের শেষ দশক ও এর আমলসমূহ

৫.১ রামাদানের শেষ দশরাত্রি

এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত :

আয়েশা (রা.) বলেন: “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শেষ দশকে [ইবাদতে] এমন সাধনা করতেন যে পরিমাণ সাধনা তিনি অন্য সময়ে করতেন না।”^{১৪৭}

আয়েশা (রা.) থেকে আরও বর্ণিত তিনি বলেন: “দশরাত্রি শুরু হলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোমর বাঁধতেন^{১৪৮}, রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং তাঁর পরিবারকে জাগিয়ে দিতেন।”^{১৪৯}

^{১৪৭} মুসলিম(১১৭৫)।

^{১৪৮} অর্থাৎ অধিক পরিমাণে ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন। এর অর্থ হিসেবে এও বর্ণিত হয়েছে যে তিনি স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগ করতেন।

^{১৪৯} বুখারী(২০২৪) মুসলিম(১১৭৪)।

অতএব একজন মুসলিমের কর্তব্য হল এই মূল্যবান সময়কে ইবাদতে মশগুল থেকে অতিবাহিত করে আখিরাতের পাথেয় বৃদ্ধি করে নেয়া, মৃত্যু এসে যাওয়ার পূর্বেই জীবনকে কাজে লাগানো।

এই দশরাত্রির বিশেষত্ব হচ্ছে: এর মাঝে রয়েছে লাইলাতুল কদর, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। অর্থাৎ এই রাত্রির ইবাদত ৮৩ বছরেরও অধিক সময়ের ইবাদতের সমতুল্য!

৫.২ লাইলাতুল কদরের কিছু বৈশিষ্ট্য

ক. এই রাত্রিতে আল-কুরআন নাযিল হয়েছে, যেমনটি আল্লাহ পাক বলেন:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾

“নিশ্চয়ই আমি একে লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি।”^{১৫০}

এর দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে:

❖ এই রাত্রিতে আল-কুরআনকে সপ্তম আসমানে অবস্থিত “লাওহে মাহফুয” থেকে প্রথম আসমানে অবস্থিত “বায়তুল-ইযযা”তে নাযিল করা হয়েছে। আর পরবর্তীতে তা ২৩ বছর ব্যাপী নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর নাযিল হয়। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এমনটি বর্ণিত রয়েছে।

❖ এই রাত্রিতে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর আল-কুরআন নাযিল হওয়া শুরু হয়েছে।

খ. এই রাত্রি হাজার মাস বা ৮৩ বছরেরও অধিক সময় অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহ পাক বলেন:

^{১৫০} সূরা আল কদর, ৯৭ : ১।

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٥٤٥﴾

“লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা অধিক উত্তম।”^{১৫৫}

গ. এই রাত্রি বরকতময়, আল্লাহ পাক বলেন :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبْرَكَةِ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٥٤٦﴾

“নিশ্চয় আমি এটি নাযিল করেছি বরকতময় রাতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।”^{১৫৬}

ঘ. এই রাত্রিতে এক বছরের জন্য লাগতে মাহফুযে লিখিত তাকদীর অনুযায়ী সকল কিছুর বিলিবর্টনের দায়িত্ব ফেরেশতাগণের নিকট অর্পিত হয়, আল্লাহ পাক বলেন :

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٥٤٧﴾

“সে রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়।”^{১৫৭}

ঙ. এই রাত্রিতে জিবরাঈল (আ.) সহ অন্যান্য ফেরেশতাগণ অবতরণ করেন, আল্লাহ পাক বলেন :

تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٥٤٨﴾

“এতে ফেরেশতাগণ এবং রুহ তাঁদের রবের অনুমতিক্রমে অবতরণ করেন সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে।”^{১৫৮}

^{১৫৫} সূরা আল কদর, ৯৭ : ৩।

^{১৫৬} সূরা আদ দুখান, ৪৪ : ৩।

^{১৫৭} সূরা আদ দুখান, ৪৪ : ৪।

^{১৫৮} সূরা আল কদর, ৯৭ : ৪।

চ. এই রাত্রি শান্তি ও নিরাপত্তার রাত্রি, আল্লাহ পাক বলেন :

سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥٤٤﴾

“শান্তিময় [বা নিরাপত্তাপূর্ণ] সেই রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত।”^{১৫৫}

অর্থাৎ শয়তান এই রাত্রিতে ক্ষতিকর কিছু করতে পারে না, এবং বান্দার অধিক ইবাদতের কারণে আল্লাহ পাকের শান্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ করে।

ছ. ঈমান সহকারে প্রতিদানের আশায় যে ব্যক্তি এই রাত্রিতে ইবাদত করবে, আল্লাহ পাক তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করবেন, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

“যে ঈমান সহকারে প্রতিদানের আশায় লাইলাতুল কদরে ইবাদত করবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।”^{১৫৬}

৫.২.১ লাইলাতুল কদর কোন রাত্রি?

লাইলাতুল কদর ঠিক কোন রাত্রিতে, তার নিশ্চিত জ্ঞান আমাদেরকে দেয়া হয়নি। এজন্য রামাদানের শেষ দশ রাত্রির প্রতিটিতেই একে অনুসন্ধান করা উচিত, আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন :

^{১৫৫} সূরা আল কদর, ৯৭ : ৫।

^{১৫৬} বুখারী(১৯০১), মুসলিম(৭৬০)।

আল্লাহর রাসূল রাম্বাদানের প্রথম দশকে ইতিকাকফ করলেন আর আমরাও তাঁর সাথে ইতিকাকফ করলাম, অতঃপর জিবরীল (আ.) তাঁর নিকট এসে বললেন: আপনি যা তালাশ করছেন তা আপনার সামনে, ফলে তিনি মধ্যবর্তী দশকে ইতিকাকফ করলেন আর আমরাও তাঁর সাথে ইতিকাকফ করলাম। অতঃপর জিবরীল (আ.) তাঁর নিকট এসে বললেন: আপনি যা তালাশ করছেন তা আপনার সামনে, ফলে রাম্বাদানের বিশ তারিখের সকালে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুৎবা দিলেন এবং বললেন: যে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে ইতিকাকফ করেছে সে যেন ফিরে যায় কেননা নিশ্চয়ই আম্মাকে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়েছে এবং নিশ্চয়ই তা আম্মাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে, তবে নিশ্চয়ই তা শেষ দশকের বিজোড় রাত্রিতে, আর আমি দেখেছি আমি যেন কাদা ও পানিতে সিজ্জদা করছি...

একই হাদীসের অপর বর্ণনায় এসেছে:

...অতঃপর তিনি ভোরের সালাত শেষ করে বের হলেন, তাঁর কপাল ও নাকের ডগা - উভয়টিতে কাদা ও পানি লেগে আছে আর তা শেষ দশকের মাঝে একুশের রাত্রি।^{১৫৭}

^{১৫৭} বুখারী(৮১৪), মুসলিম(১১৬৭)।

আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইসের (রা.) বর্ণনায় এসেছে যে তা তেইশের
রাত্রি।^{১৫৮}

কোন বর্ণনায় এসেছে:

“তাকে নবম এবং সপ্তম এবং পঞ্চমে তালাশ কর...”^{১৫৯}

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এক বর্ণনায় এসেছে, নবী (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

একে রামাদানের শেষ দশকে তালাশ কর, নবম বাকী থাকতে^{১৬০},
সপ্তম বাকী থাকতে, পঞ্চম বাকী থাকতে।^{১৬১}

এক্ষেত্রে যদি মাস তিরিশে হয় তবে জোড় রাত্রিতে লাইলাতুল কদর
হওয়ার সম্ভাবনা আর যদি উনত্রিশে হয়, তবে বিজোড় রাত্রিতে হওয়ার
সম্ভাবনা।

অপর হাদীসে বর্ণিত:

- - - - -
« »

ইবনে উম্মার (রা.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে
বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন: “তোমরা শেষ সাত্তে লাইলাতুল কদর
তালাশ কর।”^{১৬২}

^{১৫৮} মুসলিম(১১৬৮)।

^{১৫৯} মুসলিম(১১৬৭)।

^{১৬০} অর্থাৎ শেষ থেকে নবম।

^{১৬১} বুখারী(২০২১) ও অন্যান্য। এটি আবু দাউদের ভাষ্য।

আবার কোন কোন বর্ণনায় সুনির্দিষ্টভাবে সাতাশের রাত্রির উল্লেখ এসেছে:

« »

মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে লাইলাতুল কদর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: “সাতাশের রাত্রি হল লাইলাতুল কদর।”^{১৬৩}

এছাড়া সাতাশের রাত্রি লাইলাতুল কদর হওয়া বহু সাহাবীর মত।

এ সকল বর্ণনা একত্র করে বলা যায়:

❖ যে নিশ্চিতভাবে লাইলাতুল কদর পেতে চায়, তার উচ্চিং রামাদানের একুশের রাত্রি থেকে শুরু করে সকল রাত্রিতে লাইলাতুল কদর প্রাপ্তির আশায় ইবাদত করা।

❖ এর মাঝে তা বিজ্ঞোড় রাত্রিতে এবং শেষ সাত রাত্রিতে হওয়ার সম্ভাবনা অধিকতর।

❖ সাতাশের রাত্রিতে তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

❖ লাইলাতুল কদর সংক্রান্ত সকল বর্ণনাকে মিলিত করে কেউ কেউ মত দিয়েছেন যে লাইলাতুল কদর একেক বছর একেক রাত্রিতে হয়ে থাকে।

মোটকথা বুদ্ধিমান মুসলিম প্রতিবছর কোন একটি রাত্রিকেই নিশ্চিতভাবে লাইলাতুল কদর বলে গণ্য করার ঝুঁকি না নিয়ে শেষ দশরাত্রির প্রতিটিতেই ইবাদতে মশগুল হবে যেন এই মহা ফযীলতপূর্ণ রাত্রি কিছুতেই হাতছাড়া না হয়।

^{১৬২} বুখারী(২০১৫), মুসলিম(১১৬৫)।

^{১৬৩} আবু দাউদ ও অন্যান্য, আলবানীর মতে সহীহ।

৫.২.২ লাইলাতুল কদরের দুআ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত :

আয়েশা (রা.) বললেন: হে আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি আমি লাইলাতুল কদর পেয়ে যাই তবে কি বলব? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, বলবে: [আল্লাহম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিবুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী] “হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাসেন, তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন।”^{১৬৪}

৫.২.৩ লাইলাতুল কদরের লক্ষণ

হাদীসে লাইলাতুল কদরের কিছু লক্ষণের বর্ণনা এসেছে :

ঐদিন সূর্য রশ্মিবিহীন অবস্থায় উঠবে।^{১৬৫}

লাইলাতুল কদর শান্তিময় রাত্রি, খুব গরমও নয় খুব ঠাণ্ডাও নয়, এর দিবসে সূর্য লাল ও দুর্বল অবস্থায় উদ্ভিত হয়।^{১৬৬}

^{১৬৪} আহমদ ও অন্যান্য। আলবানী ও আরনাউতের মতে সহীহ।

^{১৬৫} মুসলিম(৭৬২) ও অন্যান্য। এই ভাষ্য বায়হাকীর।

^{১৬৬} ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে সহীহ ইবনে খুযায়মা, মুসনাফে তায়ালিসী গ্রন্থে। আলবানীর মতে সহীহ।

লাইলাতুল কদর ঊক্ষল রাত্রি, খুব গরমও নয় খুব ঠাণ্ডাও নয়, এই রাত্রিতে ঊক্ষাপাত হয় না।^{১৬৭}

ঊল্লেখ্য যে অভিজ্ঞতার অভাবে লাইলাতুল কদরের দিবসে সূর্যের অবস্থা নির্ণয়ে ভ্রান্তির সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ যারা নিয়মিত সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করে থাকেন, তাদের পক্ষেই সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব যে কোন একটি দিনের সূর্য অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ কিনা। যাহোক, লাইলাতুল কদরের ফযীলত অর্জনের জন্য এর লক্ষণ নির্ণয় করতে পারা জরুরী নয়। বরং যে রামাদানের শেষ দশকের প্রতি রাত্রিতেই ইবাদত করবে, সে নিশ্চিতভাবেই লাইলাতুল কদর লাভ করবে।

৫.৩ রামাদানে কিয়ামুল লাইল

রামাদানে এশার পর নফল সালাতকে তারাবী () নামকরণ করা হয়ে থাকে। রামাদানে এই সালাত আদায় করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“যে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় রামাদানে কিয়াম করল, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।”^{১৬৮}

^{১৬৭} তাবারানী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে হাসান।

^{১৬৮} বুখারী(৩৭), মুসলিম(৭৬০)।

এই সালাত জামাতের সাথে আদায় করা মুস্তাহাব। হাদীসে বর্ণিত :

) :

(

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক রাত্রিতে মসজিদে সালাত আদায় করলেন, লোকেরাও তাঁর সাথে সালাত আদায় করল, এরপর পরবর্তী রাত্রিতেও সালাত আদায় করলেন, এবারে লোক সংখ্যা বাড়ল, এরপর তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাত্রিতে তারা জুড় হলেন কিন্তু আল্লাহর রাসূল তাদের উদ্দেশ্যে বের হলেন না, ভোর হলে বললেন: “তোমরা যা করেছ তা আমি দেখেছি আর তোমাদের উদ্দেশ্যে বের হতে আমাকে কেবল এটাই বাধা দিয়েছে যে আমি ভয় করেছি যে তোমাদের প্রতি তা ফরয না হয়ে যায়” আর এটা ছিল রামাদানে।^{১৬৯}

অর্থাৎ রামাদানে তারাবী ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক হয়ে যাওয়ার ভয়ে প্রথম দু-তিনদিন জামাতের সাথে এই সালাত আদায়ের পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা জামাতে আদায় করা পরিত্যাগ করেন। তবে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকালের পর এই ভয় না থাকায় তারাবী জামাতে আদায় করা মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য হবে, যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে নিয়ে তা জামাতের সাথে আদায় করেছেন।

^{১৬৯} বুখারী(১১২৯), মুসলিম(৭৩১)।

এছাড়া হাদীসে বর্ণিত :

:

. () :

আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে আল্লাহ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: “যে ইমামের সাথে তিনি চলে যাওয়া পর্যন্ত দন্ডায়মান থাকল, তার জন্য গোটা রাত্রির কিয়াম লিখিত হবে।”^{১৭০}

আরও বর্ণিত :

:

:

আব্দুর রহমান বিন আবদ আল-কুরী বর্ণিত যে তিনি বলেন: উম্মার ইবনে আল-খাত্তাবের(রা.) সাথে রামাদানের এক রাত্রিতে মসজিদের দিকে রওয়ানা হলাম, লোকেরা খন্ড খন্ড সম্মুখিতে বিভক্ত ছিল, এক ব্যক্তি একাকী সালাত আদায় করছে, এক ব্যক্তির সালাতের সাথে একদল লোক সালাত আদায় করছে, উম্মার(রা.) বললেন: আমার মনে হয় ওদেরকে একজন কুরীর অধীনে একত্রিত করে দিলে অধিকতর উত্তম হয়, অতঃপর তিনি মনস্থির করলেন এবং তাদেরকে উবাই ইবনে কাবের(রা.) অধীনে একত্র করে দিলেন।^{১৭১}

^{১৭০} তিরমিযী(৮০৬)। আলবানীর মতে সহীহ।

^{১৭১} বুখারী(২০১০)।

৫.৩.১ তারাবীর সালাতে রাকাত সংখ্যা কত?

প্রথমত: তারাবীর সালাতের এমন কোন রাকাত সংখ্যা নির্ধারিত নেই যা অতিক্রম করা যাবে না। এর সপক্ষে দলীল হল আল্লাহর রাসূলের বক্তব্য:

“রাত্রির সালাত দুই দুই করে, আর যখন তোমাদের কেউ ফজর হয়ে যাওয়ার আশংকা করে সে এক রাকাত পড়ে নেবে যা ইতিপূর্বে আদায়কৃত সালাতকে বিজ্ঞোড় করে দেবে।”^{১৭২}

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে রাত্রির সালাত দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়তে হবে এবং এর কোন সীমা নেই। যদি এর কোন অলংঘনীয় সীমা থাকত, তবে অবশ্যই এই হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা বলে দিতেন।

তবে যদি রাত্রির সালাতের সর্বোত্তম পন্থা জানতে চাওয়া হয়, তবে সেক্ষেত্রে এর জবাব হল এই যে ১১ রাকাত আদায় করা সর্বোত্তম, কেননা তিনি রামাদানে কিংবা এর বাইরে ১১ রাকাতের অধিক আদায় করতেন না। আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান আয়শাকে (রা.) এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আয়শা (রা.) বলেন:

...

^{১৭২} বুখারী(৯৯০), মুসলিম(৭৪৯)।

“আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাদানে কিংবা এছাড়া অন্য সময়ে ১১ রাকাতের অধিক করতেন না, চার রাকাত পড়তেন, এর দৈর্ঘ্য ও সৌন্দর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না! এরপর আরও চার রাকাত পড়তেন, এর দৈর্ঘ্য ও সৌন্দর্য সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করো না! এরপর তিন রাকাত পড়তেন।...”^{১৭৩}

এই হাদীসে আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাত্রির সালাতের যে বিবরণ রয়েছে, সেটাই রাত্রির সালাতের সর্বোত্তম রূপ, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা নিয়মিত করতেন, কিন্তু তা বাধ্যতামূলক নয়, কেননা তা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাজ, নির্দেশ নয়, আর এর পূর্ববর্তী হাদীসটিও প্রমাণ করে যে ১১ রাকাত বাধ্যতামূলক নয়, যদি তাই হত তবে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা উল্লেখ করতেন।

৫.৩.২ বিশ রাকাত তারাবীর সালাতের ভিত্তি কি?

উম্মার (রা.) ২০ রাকাত তারাবীর প্রচলন করেন বলে চারজন তাবিঈ থেকে বিবরণ পাওয়া যায়:

১. আস-সাইব বিন ইয়াযিদ থেকে এ সংক্রান্ত বর্ণনা এসেছে আব্দুর রায়হাকের মুসান্নাফে, ইবনুল জাদ এর আল-মুসনাফে, বায়হাকীর সুনানে।

২. ইয়াযিদ বিন রুম্মান থেকে এ সংক্রান্ত বর্ণনা এসেছে ইমাম মালিকের মুওয়াত্তায়।

৩. ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান থেকে এ সংক্রান্ত বর্ণনা এসেছে ইবনে আবী শায়বার মুসান্নাফে।

৪. আব্দুল আযীয বিন রাফী থেকে এ সংক্রান্ত বর্ণনা এসেছে ইবনে আবী শায়বার মুসান্নাফে।

^{১৭৩} বুখারী(১১৪৭), মুসলিম(৭৩৮)।

এ সকল রিওয়ায়েত একত্র করলে উম্মারের (রা.) যুগে ২০ রাকাত তারাবী চালু থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। আলী (রা.) ও উবাইদ ইবনে কাব (রা.) থেকেও ২০ রাকাতের বিষয়টি বর্ণিত। আর এটাই শুতাইব বিন শাকল, ইবনু আবি মুল্লাইকা, আল-হারিস আল হাম্মাদানী, আবুল বাখতারী, আতা, সুফিয়ান আস সাওরী, ইবনুল মুবারক, আশ শাফিঈ (র.) প্রমুখের বর্ণনা ও মত।

এ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন: “এটা প্রমাণিত যে উবাইদ ইবনে কাব (রা.) লোকেদেরকে নিয়ে রাম্মাদানের কিয়ামে ২০ রাকাত আদায় করতেন এবং ৩ রাকাত দিয়ে বিজোড় [বিতর] করতেন, তাই অনেক আলিম মনে করেছেন যে তা সুন্নাহ, কেননা তিনি তা মুহাজির ও আনসারদের উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠা করেন অথচ কোন আপত্তি উত্থাপনকারী আপত্তি করেনি...”^{১৭৪}

এজন্য বলা যায় যে তারাবীর সালাতের রাকাতের সংখ্যার ব্যাপারে প্রশস্ততা রয়েছে, এ বিষয়ে মুসলিম ভাইদের মাঝে মতভেদ হলেও এর কারণে তাঁদের অন্তরে বিদ্বেষ কিংবা ঘৃণার জন্ম নেয়া মোটেও সমীচীন নয়, বরং এ ধরনের মতভেদের ক্ষেত্রে বন্ধকে ভাইয়ের জন্য প্রশস্ত করে দিতে হবে। আর কোন মসজিদ কিংবা এলাকা নিজেদের জন্য যে কয় রাকাতকে উপযোগী মনে করে, তাদেরকে সেই সংখ্যার ওপরই আমল করতে দেয়া উচিত।

^{১৭৪} মাজমু আল ফাতাওয়া, ২৩/১১২।

৫.৪ ইতিকাকফ

আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করাকে ইতিকাকফ বলা হয়।

ইতিকাকফ শরীয়তসম্মত হওয়ার বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ পাক বলেন:

وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ

وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

“আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, ‘তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ‘ইতিকাকফকারী ও রুকুকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর’।”^{১২৫}

وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ ۖ وَأَنْتُمْ عَنْكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ

“আর তোমরা মসজিদে ইতিকাকফরত অবস্থায় স্বীদের সাথে মিলিত হয়ো না।”^{১২৬}

তোমনি হাদীসে আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত:

^{১২৫} সূরা আল বাকারা, ২ : ১২৫।

^{১২৬} সূরা আল বাকারা, ২ : ১৮৭।

“তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাদানের শেষ দশকে ইতিকার করতেন আল্লাহ তাঁর ওয়াফাত ঘটানো পর্যন্ত, এরপর তাঁর স্থগিত তাঁর পরবর্তীতে ইতিকার করতেন।”^{১৭৭}

এছাড়া এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে বলে একাধিক আলেম উল্লেখ করেছেন, যেমন ইমাম নববী, ইবনু কুদামা, ইবনে তায়মিয়া প্রমুখ।

৫.৪.১ ইতিকারের বিধান

ইতিকার সুল্লাহ এবং মানত ছাড়া তা ওয়াজিব হয় না। রামাদানে ও রামাদান ছাড়াও ইতিকার করা শরীয়তসম্মত, তবে রামাদানে তা উত্তম, বিশেষত শেষ দশকে। হাদীসে এসেছে:

ইবনে উম্মার (রা.) থেকে বর্ণিত যে উম্মার (রা.) বলেন: “হে আল্লাহর রাসূল, আমি জাহিলিয়াতের যুগে আল-মাসজিদুল হারামে একরাত্রি ইতিকার করার মানত করেছিলাম।” তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: “তোমার মানত পূর্ণ কর।”^{১৭৮}

ইতিকারের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা শরীয়তে বেধে দেয়া হয়নি। যেমন উপরোক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায় যে ইতিকার মাত্র একরাত্রি ব্যাপীও হতে পারে, আর তা এর কম হবে না, এ কথাও বলা যায় না। এজন্য সঠিক মত হচ্ছে: যতটুকু সময় মসজিদে অবস্থান করলে একজন ব্যক্তিকে ইতিকারকারী বলা যায়, ততটুকু সময়ই ইতিকারের জন্য যথেষ্ট।

^{১৭৭} বুখারী(২০২৬), মুসলিম(১১৭২)।

^{১৭৮} বুখারী(৬৬৯৭)।

৫.৪.২ ইতিকাকের স্থান

সালাতের জন্য ওয়াকফ করা মসজিদ ছাড়া অন্যত্র ইতিকাক বৈধ নয়, কেননা আল্লাহ পাক বলেন:

وَلَا تَبْلِسْ رُوهٖ ۖ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ

“আর তোমরা মসজিদে ইতিকাকেরত অবস্থায় স্বীকের সাথে মিলিত হয়ো না।”^{১৭৬}

আর পুরুষের জন্য ইতিকাক এমন মসজিদে হতে হবে যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জামাত হয়, কেননা নতুবা তাঁকে পাঁচবার মসজিদ থেকে বের হতে হবে, যা ইতিকাকের সংজ্ঞার বিরোধী। আর জাম্মে মসজিদে [অর্থাৎ যে মসজিদে জুমুয়া পড়া হয়] ইতিকাক করা উত্তম, যেন জুমুয়া আদায় করার নিমিত্তে ইতিকাককারীকে বের হতে না হয়।

৫.৪.৩ ইতিকাককারীর করণীয়

ইতিকাককারী বেশী বেশী ব্যক্তিগত ইবাদতে মশগুল থাকবে, যেমন যিকর, কুরআন তিলাওয়াত, সালাত ইত্যাদি। ইতিকাক অবস্থায় সামাজিক বা সামর্থিক কল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদত যেমন: জ্ঞানার্জন, দুইনশিক্ষা দেয়া ইত্যাদির তুলনায় ব্যক্তিগত ইবাদত অধিকতর উত্তম, কেননা সেটাই নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ।

ইতিকাককারী অনর্থক কথা ও কাজ বর্জন করবেন এবং ইবাদত ব্যতীত অন্যন্য জায়েয কথা ও কাজও যথাসম্ভব কম করবেন।

^{১৭৬} সূরা আল বাকারা, ২ : ১৮৭।

অনিবার্য কোন কারণ ছাড়া ইতিকারকারী মসজিদ থেকে বের হবেন না:

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “আর নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে থাকা অবস্থায় আমার দিকে তাঁর মাথা বাড়িয়ে দিতেন আর আমি তা আঁচড়ে দিতাম আর ইতিকারের অবস্থায় প্রয়োজন ছাড়া ঘরে ঢুকতেন না।”^{১৮০}

কেননা প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হওয়া ইতিকারের সংজ্ঞার বিরোধী, আর এই বিধানের ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। তবে কি কি কারণে বের হওয়া বৈধ, সে বিষয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। যাহোক ইতিকার অবস্থায় বের হওয়ার বৈধ কারণগুলো নিম্নরূপ:

ক. প্রাকৃতিক প্রয়োজনে।

খ. পানাহারের উদ্দেশ্যে, যদি তাকে খাবার এনে দেয়ার মত কেউ না থাকে, অথবা মসজিদে পানাহার তার জন্য অশোভনীয় হয় ও তার মর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকর হয়, অথবা যদি মসজিদ নোংরা হওয়ার ভয় থাকে, অথবা যদি কর্তৃপক্ষ মসজিদে বাইরে থেকে খাদদ্রব্য আনয়নকে নিষিদ্ধ করে থাকেন।

গ. উদ্ভূত কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে, যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রী সাকিয়াকে (রা.) বাসায় পৌঁছে দেয়ার জন্য বের হয়েছিলেন।^{১৮১}

^{১৮০} বুখারী(২০২৯), মুসনিম(২৯৭)।

^{১৮১} বুখারী(২০৩৫), মুসনিম(২৯৭৫)।

ঘ. রোগী দেখতে যাওয়া কিংবা জানাযার সঙ্গী হওয়ার জন্য। আলী (রা.) ও আমর বিন হারীস (রা.) প্রমুখ থেকে এমনটি বর্ণিত আছে।

ইতিকাকারীর জন্য স্বীকে উপভোগ করা বৈধ নয়, কেননা আল্লাহ পাক বলেন:

وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ ۖ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ

“আর তোমরা মসজিদে ইতিকাকারত অবস্থায় স্বীদের সাথে মিলিত হয়ো না।”^{১৮২}

আর এ ব্যাপারে ইজমা বা ঐক্যমত্য রয়েছে।

মাসআলা ৫.৪.৪ : রামাদানের শেষ দশদিন ইতিকাক সন্নাহ। যে এই সন্নাহ পালন করতে চায় সে রামাদানের ২০ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্বেই ইতিকাক শুরু করবে।

৫.৪.৫ নারীর ইতিকাক

পুরুষদের মতই নারীরাও ইতিকাক করতে পারেন, রামাদানের শেষ দশকের ইতিকাক নারীদের জন্যও সন্নাহ, হাদীসে আয়শা(রা.) থেকে বর্ণিত :

“তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাদানের শেষ দশকে ইতিকাক করতেন আল্লাহ তাঁর ওয়াফাত ঘটানো পর্যন্ত, এরপর তাঁর স্বীগণ তাঁর পরবর্তীতে ইতিকাক করতেন।”^{১৮৩}

^{১৮২} সূরা আল বাকারা, ২ : ১৮৭।

^{১৮৩} বুখারী(২০২৬), মুসলিম(১১৭২)।

মাসআলা ৫.৪.৫.১: নারীর ইতিকাহের জন্য স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন। এছাড়া নারীর ইতিকাহের কারণে কোন ফিতনার সম্ভাবনা না থাকলে তবেই তা বৈধ হবে। কেননা জায়েয বা মুস্তাহাব কোন কিছু যদি হারামের পথ উন্মুক্ত করে, তবে সেক্ষেত্রে তা নিষিদ্ধ হিসেবে গণ্য হবে।

মাসআলা ৫.৪.৫.২: ঘরে নারীর ইতিকাহ বিস্তৃত নয়, কেননা ইতিকাহের স্থান মসজিদ, যেমনটি ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। নারীর ক্ষেত্রেও ইতিকাহ মসজিদে হবে, এর সপক্ষে অপর একটি দলীল হল এই যে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রীগণ তাঁর কাছে মসজিদে ইতিকাহের অনুমতি চেয়েছিলেন, অতঃপর তিনি তাদেরকে অনুমতি দেন। তবে নারীর ক্ষেত্রে এমন মসজিদেও ইতিকাহ হতে পারে যেখানে জামাত হয় না, কেননা জামাতে যোগদান নারীর জন্য জরুরী নয়।

৫.৫ যাকাতুল ফিতর

রামাদানের সমাপ্তি উপলক্ষে যে দান করা হয়, তাকে যাকাতুল ফিতর বলা হয়। এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন:

- -

“আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাওম পালনকারীর জন্য অনর্থক ও অশ্লীল কথা ও কাজের কাফফারা এবং মিসকীন খাওয়ানোর নিমিত্তে ফিতরা বাধ্যতামূলক করেছেন, যে সালাতের পূর্বে তা আদায় করল, তা কবুল ফিতরা হল, আর যে সালাতের পর তা আদায় করল, তা সাধারণ দানের মধ্যে একটি দান হিসেবে গণ্য হল।”^{১৮৪}

^{১৮৪} আবু দাউদ, ইবনে মাছাহ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে হাসান।

মাসআলা ৫.৫.১: ঈদের রাত্রি ও দিবসের জন্য নিজের ও অধীনস্থদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের অতিরিক্ত যার আছে, তার ওপর ফিতরা ওয়াজিব।

মাসআলা ৫.৫.২: একজন ব্যক্তির ওপর নিজের পক্ষ থেকে এবং যাদের ভরণপোষণ তার ওপর বাধ্যতামূলক তাদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করা বাধ্যতামূলক। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন:

“তোমরা যাদের ব্যয়ভার বহন কর, তাদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় কর।”^{১৮৫}

মাসআলা ৫.৫.৩: ফিতরা আদায় করতে হবে দেশের প্রচলিত খাদ্যদ্রব্য দিয়ে।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন: “আমরা রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে ফিতরের দিনে খাদ্যদ্রব্যের এক সা’ দান করতাম।” এবং আবু সাঈদ (রা.) বলেন: “যব, কিসমিস, পনীর ও খেজুর ছিল আমাদের খাদ্য।”^{১৮৬}

^{১৮৫} দারাকুতনী এ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আলবানীর মতে হাসান।

^{১৮৬} বুখারী(১৫১০)।

উপরোক্ত হাদীস থেকে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বের হয়ে আসে:

১. ফিতরার পরিমাণ ১ সা' পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য, যা আধুনিক পরিমাপে ৩ কেজি প্রায়। অবশ্য গমের ক্ষেত্রে অর্ধেক সা - ই যথেষ্ট:

...

আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “আমরা আল্লাহর রাসুলের যুগে দুই মুদ গমের দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় করতাম...”^{১৮৭}

২. ফিতরা আয়তনের মাধ্যমে পরিমাপকৃত খাদ্যদ্রব্য থেকে হতে হবে, কেননা সা হল আয়তনভিত্তিক পরিমাপের একক। সুতরাং যা খাদ্য নয়, তার দ্বারা ফিতরা আদায় হবে না: যেমন অর্থ। আর যা আয়তন দিয়ে মাপা যায় না, তা খাদ্য হলেও তার দ্বারা ফিতরা আদায় হবে না, যেমন: মাংস, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি - কেননা তা ওজনের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়।

মাসআলা ৫.৫.৪: যাকাতুল ফিতর ঈদের সালাতের পূর্বে আদায় করতে হবে যেমনটি ইতিপূর্বে ইবনে আব্বাসের (রা.) বক্তব্যে বর্ণিত হয়েছে, এছাড়া ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

^{১৮৭} আহমদ। আরনাউতের মতে সহীহ।

“আল্লাহর রাসূল মুসলিমদের স্বাধীন ব্যক্তি, দাস, পুরুষ, নারী, ছোট, বড়দের ওপর এক সা খেজুর বা এক সা গম্ন যাকাতুল ফিতর হিসেবে বাধ্যতামূলক করেছেন, এবং সালাতের দিকে লোকেদের বের হওয়ার আগেই যেন তা আদায় হয়, তার নির্দেশ দিয়েছেন।”^{১৮৮}

তবে ঈদের এক অথবা দুইদিন আগে তা আদায় করা জায়েয:

:

নাফি' থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “ইবনে উম্মার (রা.) যারা তা নিত তাদেরকে তা দিতেন এবং তাঁরা ফিতরের এক অথবা দুদিন আগে তা দান করতেন।”^{১৮৯}

মাসআলা ৫.৫.৫: যাকাতুল ফিতর মিসকীনরা পাবে, তবে শরীয়তে তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়নি। আর তাই একজনের ফিতরা একাধিক মিসকীনকে বর্টন করে দেয়া যাবে আবার একাধিক ব্যক্তির ফিতরা একজনকে দেয়া যাবে।

^{১৮৮} বুখারী(১৫০৩), মুসলিম(৯৮৪)।

^{১৮৯} বুখারী(১৫১১)।

পরিশিষ্ট - ১ :

আত্মশুদ্ধিকরণের জন্য নির্বাচিত কুরআনের আয়াত ও হাদীসের তালিকা

কুরআনের আয়াত

১.

أَنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

“বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।”

২.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন।”

৩.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ

الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ

“আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়।”

৪.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا
هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“রামাদান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের সহজতা চান এবং কাঠিন্য চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর।”

৫.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

“আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।”

৬.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“এবং নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।”

৭.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَهَا

“আল্লাহ কাউকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে বেশী বোঝা চাপান না।”

৮.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর...”

৯.

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ

“আর এ বিষয়ে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন পাপ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে (পাপ হবে)।”

১০.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

“হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।”

১১.

وَلَا تَبَشِّرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ

“আর তোমরা মসজিদে ইঁতিকাফরত অবস্থায় স্বীদের সাথে মিলিত হয়ো না।”

হাদীস

১.

“আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দুইনের জ্ঞান দান করেন।” ^{১১০}

২.

“সাধারণ ইবাদতকারীর ওপর আলেমের মর্যাদা তোমাদের সবচেয়ে সাধারণ ব্যক্তির তুলনায় আমার মর্যাদার অনুরূপ...” ^{১১১}

৩.

“যে হেদায়েতের প্রতি আহ্বান জানালো, তার জন্য যারা তার অনুসরণ করবে, তাদের সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে, অথচ তা তাদের সওয়াব থেকে কোন কিছুই হ্রাস করবে না...” ^{১১২}

৪.

«	»
“যে ভালকাজের পথ প্রদর্শন করল, তার জন্য রয়েছে এর সম্পাদনকারীর অনুরূপ সওয়াব” ^{১১৩}	

^{১১০} বুখারী, মুসলিম।

^{১১১} তিরমিযী। আলবানীর মতে সহীহ।

^{১১২} মুসলিম(২৬৭৪)।

^{১১৩} মুসলিম(১৮৯৩)।

৫.

»

«

“যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তার আমল তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, কেবল তিনটি বিষয় থেকে ব্যতীত, অবিরত সাদাকা থেকে, উপকৃত হওয়া যায় এমন জ্ঞান থেকে অথবা সংকর্ষশীল সত্তান যে তার জন্য দু'আ করে।”^{১৯৪}

৬.

যে জ্ঞানের অন্বেষণে কোন পথ চলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথগুলোর একটি পথে পরিচালিত করেন^{১৯৫}

৭.

নিশ্চয়ই ফেরেশতাগণ জ্ঞান অন্বেষণকারীর প্রতি সন্তুষ্টির কারণে তাঁদের ডানাগুলো অবনমিত করে দেন^{১৯৬}

৮.

নিশ্চয়ই [সাধারণ] ইবাদতকারীর তুলনায় আলেমের মর্যাদা সকল তারার তুলনায় পূর্ণিমার রাত্রিতে পূর্ণচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের ন্যায়^{১৯৭}

^{১৯৪} মুসলিম(১৬৩১)।

^{১৯৫} আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

^{১৯৬} আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

^{১৯৭} আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

৯.

»

«

নিশ্চয়ই আলেক্সগণ নবীদের উত্তরাধিকারী, এবং নিশ্চয়ই নবীগণ দীনার কিংবা দিরহামের উত্তরাধিকার দিয়ে যাননি, বরং জ্ঞানের উত্তরাধিকার দিয়ে গিয়েছেন, অতএব যে তা গ্রহণ করল, সে এক বিরাট সোভাগ্যের অধিকারী হল”^{১৯৮}

১০.

»

«

নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং পৃথিবী ও আকাশবাসী, এমনকি পিপড়া তার গর্ভে এবং মাছ পর্যন্ত মানুষকে উত্তম বিষয় শিক্ষাদানকারীর ওপর সালাত পেশ করে।^{১৯৯}

১১.

:

“পাঁচটির পূর্বে পাঁচটিকে কাজে লাগাও: তোমার মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে, তোমার অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, তোমার ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে, তোমার বার্ষিক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকে, তোমার দারিদ্রের পূর্বে তোমার স্বচ্ছলতাকে”^{২০০}

^{১৯৮} আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

^{১৯৯} তিরমিযী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

^{২০০} হাকিম।

১২.

আদম সত্তানের প্রতিটি আমল তার জন্য কেবল সিয়াম ছাড়া, নিশ্চয়ই তা আমারই জন্য আর আমিই তার প্রতিদান দেব।^{২০১}

১৩.

যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তার শপথ, রোযাদারের মুখের পরিবর্তিত ম্বাণ আল্লাহর নিকট মেশকের সুম্মানের চেয়েও উত্তম।^{২০২}

১৪.

রোযাদারের জন্য রয়েছে দুটি আনন্ড, একটি আনন্ড ইফতারের মুহুর্তে আর একটি আনন্ড তার রবের সাথে সাক্ষাতের মুহুর্তে।^{২০৩}

১৫.

“সিয়াম হচ্ছে ঢাল, অতএব [রোযাদার] যেন অশালীন বাক্যব্যয় ও মূর্খতাপূর্ণ আচরণ না করে, আর যদি কেউ তার সাথে লড়তে আসে কিংবা তাকে গালি দেয়, তবে যেন দুবার বলে: আমি রোযাদার।”^{২০৪}

^{২০১} বুখারী, মুসলিম।

^{২০২} বুখারী, মুসলিম।

^{২০৩} বুখারী, মুসলিম।

^{২০৪} বুখারী, মুসলিম।

১৬.

“যে বাতিল কথা ও কাজ এবং মুর্থতাপূর্ণ আচরণ পরিত্যাগ করল না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।”^{২০৫}

১৭.

“অনেক রোযাদারেরই সাওমের দ্বারা অর্জন কেবল ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আর বহু নামাযীরই কিয়ামের দ্বারা অর্জন কেবল রাত্রি জাগরণ।”^{২০৬}

১৮.

«

»

“যে ফজরের পূর্বেই রাত্রিতে সিয়ামের সংকল্প করেনি তার সিয়াম নেই।”

১৯.

আসমা বিনতে আবু বকর(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

“নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে এক মেঘের দিনে আমরা ইফতার করলাম, এরপর সূর্য উদ্দিত হল।”^{২০৭}

^{২০৫} বুখারী(৬০৫৭)।

^{২০৬} আহমদ, আদ-দারিমী, ইবনু খুযায়মা। ইবনু হিব্বান ও আল-হাকিম একে সহীহ গণ্য করেছেন। আরনাউতের মতে এর সনদ “জায়িদ”। এর সমর্থনকারী অন্যান্য হাদীস রয়েছে।

^{২০৭} বুখারী(১৯৫৯)।

২০.

“যখন এদিক থেকে রাত্রির আগমন হয় এবং এদিক থেকে দিবস প্রস্থান করে আর সূর্যাস্ত যায়, তখন সাওম পালনকারীর ইফতার [এর সময়] হয়।”^{২০৮}

২১.

“মানুষ কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতদিন তারা শীঘ্র ইফতার করবে।”^{২০৯}

২২.

“দুইন বিজয়ী থাকবে যতদিন মানুষ শীঘ্র ইফতার করবে, কেননা ইহুদী ও নাসারারা [ইফতারে] বিলম্ব করে।”^{২১০}

২৩.

“আল্লাহর রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) [মাগরিবের] সালাতের পূর্বে সতেজ খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন, সতেজ খেজুর না থাকলে শুকনো খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন, আর তা না থাকলে কয়েক চোক পানি পান করতেন।”^{২১১}

^{২০৮} বুখারী(১৯৫৪), মুসলিম(১১০০)।

^{২০৯} বুখারী(১৯৫৭), মুসলিম(১০৯৮)।

^{২১০} আবু দাউদ। আলবানীর মতে হাসান।

^{২১১} আবু দাউদ, তিরমিযী। আলবানীর মতে হাসান সহীহ।

২৪.

« »

“তৃক্ষা বিদূরিত হয়েছে, শিরা-উপশিরা আদ্র হয়েছে আর আল্লাহ চাইলে সপ্তয়াব নির্ধারিত হয়েছে।”^{২১২}

২৫.

« »

“তোমরা সেহরী কর, কেননা সেহরীতে বরকত রয়েছে।”^{২১৩}

২৬.

« »

“আহলে কিতাব ও আমাদের সিয়ামের পার্থক্য হল সেহরী।”^{২১৪}

২৭.

« »

“বিলাল রাত্রিতেই আযান দেয় অতএব ইউনে উম্মে মাকতুম(রা.) আযান দেয়া পর্যন্ত পানাহার কর।”^{২১৫}

২৮.

« »

“তোমরা তা[চাঁদ] দেখে সাওম শুরু কর এবং তা[চাঁদ] দেখে সাওম শেষ কর, আর যদি তা তোমাদের নিকট অদৃশ্য হয় তবে শাবানের ৩০ দিন পূর্ণ কর।”^{২১৬}

^{২১২} আবু দাউদ, নাসাঈ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে হাসান।

^{২১৩} বুখার(১৯২৩), মুসলিম(১০৯৫)।

^{২১৪} মুসলিম(১০৯৬)।

^{২১৫} বুখারী(৬২২) ও মুসলিম(১০৯২)।

^{২১৬} বুখারী(১৯০৯), মুসলিম(১০৮১)।

২৯.

“সাপ্তম হল সেদিন যেদিন তোমরা [সকলে] সিয়াম পালন কর, আর ইফতার হল সেদিন যেদিন তোমরা [সকলে] ইফতার কর আর ‘আদহা’ হল সেদিন যেদিন তোমরা তোমাদের পশু যবেহ কর।”^{২৯৭}

৩০.

“এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ছাড়, যে তা গ্রহণ করল, তা উত্তম। আর যে সাপ্তম পালন করতে চায় তার কোন প্রনাহ নেই।”^{২৯৮}

৩১.

“সফরে সাপ্তম পালন কোন উত্তম কাজ নয়।”^{২৯৯}

৩২.

“নিশ্চয়ই আল্লাহ মুসাফিরের জন্য সাপ্তম এবং সালাতের অর্ধেক লাঘব করেছেন এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিনীর জন্যও।”^{৩০০}

৩৩.

^{২৯৭} তিরমিযী ও অন্যান্য। আনবানীর মতে সহীহ।

^{২৯৮} মুসলিম(১১২১)।

^{২৯৯} বুখারী(১৯৪৬), মুসলিম(১১১৫)।

^{৩০০} আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই এবং অন্যান্য। আনবানী ও আরনাউত এর মতে হাসান।

“স্বামী উপস্থিত থাকলে তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন নারীর জন্য সাপ্তম পালন জায়েয নয়।”^{২২১}

৩৪.

“পালনীয় সিয়াম রেখে যে মারা গেল, তার ওলী তার পক্ষে সাপ্তম পালন করবে।”^{২২২}

৩৫.

“যার বমি হয়ে যায় তারা কাযা করতে হবে না, আর যে বমির উদ্বেক করল, তার কাযা করতে হবে।”^{২২৩}

৩৬.

“নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমার উম্মাতের লোকদের অস্তরসমূহের ওয়াসওয়াসাকে ক্ষমা করেছেন যতক্ষণ না তারা আমল করে কিংবা ব্যক্ত করে।”^{২২৪}

৩৭.

“নিশ্চয়ই আল্লাহর আমার উম্মাতের অনিচ্ছাকৃত ক্রটি, ভুল ও অনিচ্ছা সত্ত্বে তাদেরকে দিয়ে যা করানো হয়েছে - তা ক্ষমা করেছেন।”^{২২৫}

^{২২১} বুখারী(১৯৫০), মুসলিম(১১৪৬)।

^{২২২} বুখারী(১৯৫২), মুসলিম(১১৪৭)।

^{২২৩} আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ। আলবানীর মতে সহীহ।

^{২২৪} বুখারী(৫২৬৯), মুসলিম(১২৭)।

^{২২৫} ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য। হাদীসটি দুর্বল, তবে আল-কুরআন ও সুন্নাতে এর বক্তব্যের সমর্থন রয়েছে।

৩৮.

“নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোযাদার থাকা অবস্থায় চুম্বন ও স্পর্শ করতেন, আর তিনি তোমাদের মধ্যে নিজের কামনাকে সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণকারী।”^{২২৫}

৩৯.

ইবনে আব্বাস(রা.) থেকে বর্ণিত যে “নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহরাম অবস্থায় রক্ত-নির্গমন করিয়েছেন এবং রোযাদার অবস্থায় রক্ত নির্গমন করিয়েছেন।”^{২২৬}

৪০.

« »

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: “‘হাজ্জিম’ এবং ‘মাহজুম’ উভয়েরই ইফতার হয়েছে [হবে]”^{২২৮}

৪১.

« »

“রোযাদার অবস্থায় যে ভুলে গেল, ফলে পানাহার করল, সে যেন তার সাওম পূর্ণ করে, কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।”^{২২৯}

^{২২৫} বুখারী(১৯২৭), মুসলিম(১১০৬)।

^{২২৬} বুখারী(১৯৩৮)।

^{২২৮} আহমদ, আবু দাউদ, নাসাই, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। আলবানীর মতে সহীহ।

^{২২৯} বুখারী(), মুসলিম(১১৫৫)।

৪২.

“আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় সালাত হল দাঁউদের(আ.) সালাত এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় সিয়াম হল দাঁউদের(আ.) সিয়াম, তিনি অর্ধেক রাত্রি ঘুমাতেন, এক তৃতীয়াংশ তাহাজ্জুদ আদায় করতেন আবার এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। এবং তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন আর একদিন ইফতার করতেন”^{২৩০}

৪৩.

“যে আজীবন রোযা রাখল সে রোযা রাখে নি।”^{২৩১}

৪৪.

« »
“যে রামাদানের সাওম পালন করে শাওয়ালের ছয়টি দিবে তার অনুসরণ করল, তা সারা বছর সাওমের মত হল।”^{২৩২}

৪৫.

« »
“ওটা এমন দিন যেদিন আমার জন্ম হয়েছে, এবং যেদিন আমাকে পাঠানো বা আমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে।”^{২৩৩}

^{২৩০} বুখারী(১১৩১), মুসলিম(১১৫৯)।

^{২৩১} বুখারী(১৯৭৭), মুসলিম(১১৬২)।

^{২৩২} মুসলিম(১১৬৪)।

^{২৩৩} মুসলিম(১১৬২)।

৪৬.

!

হে আবু যার! যদি তুমি মাসের তিনদিন সাওম পালন কর তবে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ সাওম পালন কর।^{২৩৪}

৪৭.

“তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই জুমুআর দিনের সাথে তার পূর্বের বা পরের দিন যুক্ত করা ছাড়া সাওম পালন না করে।”^{২৩৫}

৪৮.

“যে ঈমান সহকারে প্রতিদানের আশায় লাইলাতুল কদরে ইবাদত করবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।”^{২৩৬}

৪৯.

“যে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় রামাদানে কিয়াম করল, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।”^{২৩৭}

^{২৩৪} আহমদ, তিরমিযী। আলবানীর মতে হাসান সহীহ।

^{২৩৫} বুখারী(১৯৮৫), মুসলিম(১১৪৪)।

^{২৩৬} বুখারী(১৯০১), মুসলিম(৭৬০)।

^{২৩৭} বুখারী(৩৭), মুসলিম(৭৬০)।

৫০.

“যে ইমামের সাথে দন্ডায়মান থাকল যতক্ষণ না তিনি চলে যান, তার জন্য গোটা রাত্রির কিয়াম লিখিত হবে।”^{২৩৮}

৫১.

“যে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় রামাদানে সাওম পালন করল, তার অতীতের সমস্ত পুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।”^{২৩৯}

৫২.

“রাত্রির সালাত দুই দুই করে, আর যখন তোমাদের কেউ ফজর হয়ে যাওয়ার আশংকা করে সে এক রাকাত পড়ে নেবে যা ইতিপূর্বে আদায়কৃত সালাতকে বিজোড় করে দেবে।”^{২৪০}

৫৩.

“আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাদানে কিংবা এছাড়া অন্য সময়ে ১১ রাকাতের অধিক করতেন না...”^{২৪১}

^{২৩৮} তিরমিযী(৮০৬)। আলবানীর মতে সহীহ।

^{২৩৯} বুখারী(৩৭), মুসলিম(৭৬০)।

^{২৪০} বুখারী(৯৯০), মুসলিম(৭৪৯)।

^{২৪১} বুখারী(১১৪৭), মুসলিম(৭৩৮)।